শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা

রফীক আহমদ

গোয়েন্দা সিরিজ—২

শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা

রফিক আহ্‌মদ

মাকতাবাতুল কুরআন
(নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

খোদার পথে শহীদ

ডিএমআই-এর কবলে

আইবি হেড কোয়ার্টারে ধামাকা

খোদার পথে শহীদ

তারাপুর এটমি প্লান্ট ফাইলে তারিখ বাই তারিখ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় ইউরেনিয়াম কেন্দ্র থেকে ইউরেনিয়াম বোঝাই ট্রাকের টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যাতায়াতের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ ছিল। আর এটাও উল্লেখ ছিল যে, যাত্রাপথে একটি ট্রাক বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিহত হয় ট্রাক ড্রাইভার ও একজন কমান্ডো। আহত হয় আরও তিনজন। অদূর ভবিষ্যতে যাতে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার অবতারণা না হয় সেজন্য তারাপুর গবেষণাগারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ক্যাপ্টেন (সিফট্ ইনচার্জ)কে সতর্ক করে ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করে একটি পত্র লেখা হয়। তাছাড়া প্রতিটি ট্রাকে বোঝাইকৃত ইউরেনিয়ামের বাক্স সংখ্যা পরিমাপ ও গন্ত ব্যস্থলে পৌঁছার প্রাপ্তি রসিদ ছিল। এটা ছাড়াও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যানের লিখিত দুটি পত্রও ছিল– যে পত্রে চেয়ারম্যান সাহেব সফল ট্রান্সপোরেশন এবং সিকিউরিটির (Fool PROOF ব্যবস্থাপনায় সেনা প্রধানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং সফল গবেষণার ফলাফল হিসেবে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে একটি উপহার প্রদানের আগাম শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন।

আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে, এ বহুল তথ্যসম্বলিত ফাইল পাকিস্তানে পৌঁছার পর পাকিস্তানের বিজ্ঞান বিশারদগণ ভারতের এটমি রিসার্চে আকাশ-কুসুম সফলতার পরিমাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে। আমি পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর প্রচার মাধ্যমে জানতে পারি যে রাজস্থানে ভারতের এটমি ধামাকার গোপন সংবাদ পাকিস্তানের TOP BRASS দীর্ঘ আট মাস পূর্বেই জানতে পেরেছে। রাজস্থানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনাগোনা ও বিশাল এলাকা জুড়ে Restricted Zone বানানো, বিশাল ও গভীর সুড়ঙ্গ খননের খবরও পাকিস্তানের দুঃসাহসী সেনা বাহিনী জানতে পায়। আমাদের প্রেরিত ফাইলে লিখিত, টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পাঠানো উৎপাদিত ইউরেনিয়ামের ওজনের মাধ্যমে আমাদের বিজ্ঞান বিশারদগণ ভারতের অভূতপূর্ব ধামাকার ক্ষয়-ক্ষতির কার্যকারিতার সঠিক পরিমাপ

নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। এ সকল তথ্যের বিস্তারিত রিপোর্টের এক কপি তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (চীফ এক্সিকিউটিভ) মি. জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছেও পাঠানো হয়। এ রিপোর্ট এক কপি করে পাকিস্তানের সরকার U.N.O ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং সমস্ত মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পাঠায়। এছাড়া পাকিস্তানী প্রেস ভারতীদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত পারমাণবিক পরীক্ষার সংবাদ এমনভাবে প্রচার করে যে আচমকা ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা পাকিস্তানী জনগণের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে না পারে। আর এভাবেই আচানক ধামাকা করে পাকিস্তানী জনতার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের ভারতীয় দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতের এ ব্যর্থতায় আমাদের প্রেরিত ফাইলও মোক্ষম ভূমিকা পালন করে।

আমি প্রবীণ চৌকস জেনারেলদের চার্টআপ সিক্রেট ডায়েরির দিকে বারবার উৎসুক নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ এ ডায়েরিতে লেখা ছিল ঢাকা পতনের পর ভারতীয় সেনা বাহিনীর পরিবর্তন পরিবর্ধন ও ৫টি ইনফেন্টারী ডিভিশন এবং একটি আর্মড ডিভিশন সম্বলিত নতুন ছয়টি ডিভিশনের নির্দেশিকা। প্রতিটি নতুন ইনফেন্ট্রি ডিভিশনকে প্রবীণ ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের এক চতুর্থাংশ সদস্যের সমন্বয়ে সুন্দরভাবে সাজাতে বলা হয়েছে। তাছাড়া একটি নতুন MOUNTAIN DIVITION RAISE করার নির্দেশও করা হয়। যারা রাশিয়ার আধুনিক অস্ত্রে ও হালকা তোপ কামানে সজ্জিত হবে। আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে চিশ্চিত হলাম যে, এদেরকে একমাত্র কাশ্মীরী জনগণ দমনের জন্যই প্রস্তুত করা হচ্ছে। ঢাকা পতনের পর এ সকল মুক্তি পাগল জনতার দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত আযাদীর স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায় যা আজও বাস্তবতার মুখ দেখতে পায়নি। এক পত্রে জেনারেল লেপপা সেক্টরের ব্রিগেড কমান্ডারকে ওয়াদী লেপপার উপর দখল বজায় রাখার জন্যে কঠোর নির্দেশ দেন। (ঢাকা পতনের পূর্বে ওয়াদী লেপপা পাকিস্তানের দখলাধীনে ছিল)। সিজফায়ার লাইনকে শিমলা চুক্তির পর কন্ট্রোল লাইন নামে নামকরণ করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী সিজফায়ার লাইনকে সোজা করার বাহানায় ওয়াদী লেপপাকেও ভারত কবলিত কাশ্মীরের সাথে মিলিয়ে একাকার করে ফেলে। তখন পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য হয়েই এমন অপমানকর সিদ্ধান্ত বিনা বাক্যে মেনে নিতে হয়। আর মেনে নেয়া ছাড়া পাকিস্তানের কি-ই বা করার আছে। যেখানে

ভারত পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা দখল করে নিয়েছে, শুধু কি এতটুকু? না, বরং ভারতের হাতে পাকিস্তানের নব্বই হাজার সৈন্য যুদ্ধবন্দী। তাই ভারত এখন যেমন খুশি তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর পাকিস্তানকে হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্যে ও বন্দি সৈন্যদের মুক্ত করতে এমন অযৌক্তিক ভারতের দাবি মেনে নিতে হয় যে দাবি পাকিস্তান সরকার ও জনগণের পক্ষে মেনে নেয়া কখনও সম্ভব নয়।

ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক বডিগার্ড রাজা সরফরাজের মারফত জানতে পারি (সরফরাজ প্রথমে DSP ছিল পরবর্তীতে DIG হয়ে রিটায়ার্ড করেন।) যে শিমলা চুক্তির শেষ অবধি মতানৈক্য চলতেই থাকে। পাকিস্তানী ডেলেগেশনের সকল সদস্যই পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের জন্য লাগেজ প্যাকেট করে ফেলেছে। পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের ভারত ত্যাগ করার কথা। রাতের ভোজন শেষে শিমলা সার্কিট হাউসে ইন্দিরা গান্ধী ও ভুট্টো পায়চারী করার জন্যে বাহারী ফুলের সমারোহে সুশোভিত মনোমুগ্ধকর সুন্দর বাগানে ঢুকে পড়ে। আর সেখানেও শুরু হয় যুদ্ধবন্দির আলোচনা। ভুট্টো বলেন, মিস্টার গান্ধী! পাকিস্তানী বন্দিদের ফেরত নেয়ার ব্যাপারে আমার কোন ইচ্ছা নেই। যোদ্ধারা বন্দির শিকল পরিধান করার পর পাক বাহিনীর জন্যে বেকার হয়ে গেছে। তাদের দ্বারা পাক বাহিনীর আর কোন কাজ হবে না। যদি তাদেরকে পাকিস্তানে ফের নিই তবে তাদেরকে রিটায়ার্ড করিয়ে পেনশন দেয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। আর তখন নব্বই হাজার অন্নহীন মানুষের অন্নের সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিবে। আর সে সমস্যার সমাধান পাকিস্তানের জন্যে সম্ভব নয়। তার চেয়ে উত্তম হলো তাদেরকে আপনার ছায়াতলেই রেখে দেন এবং জেনেভা কনভেনশনের নীতি অনুযায়ী তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সুযোগ ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখুন। এটা ছিল ভুট্টো সাহেবের ভগ্নহৃদয়ের ব্যথিত আকুতি। ইন্দিরা গান্ধী একে তো হিন্দু, তারপর আবার মহিলা। তাছাড়া সর্বদা নব্বই হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দির অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও অন্যান্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধাদির এ বিশাল ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হয়। আর যা করতে গিয়ে ভারতের কোষাগার শূন্যের পথে। তাই ইন্দিরা গান্ধী ভুট্টোর আকুতি শুনে একেবারে ভড়কে যায়। তখন কোন দিশা না দেখে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার সেই আকাশসম ডিমান্ডের উক্তি প্রত্যাখ্যান করে

তৎক্ষণাৎ শিমলা চুক্তিনামা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। ঘুমন্ত সেক্রেটারীদের জাগিয়ে দেয়া হয় এবং রাত দু'টা পর্যন্ত হৃদয়গ্রাহী চুক্তিনামা সংশোধন করে পরিশেষে দুই দেশের প্রেসিডেন্টের সামনে দস্ত খতের জন্যে পেশ করা হয়। রাতের প্রথম প্রহরেই উভয় দেশের প্রেসিডেন্ট চুক্তিপত্রে দস্তখত করেন।

আলোচনা চলতে ছিল ওয়াদী লেপপার ব্যাপারে। কন্ট্রোল লাইন মানচিত্রে ওয়াদী লেপপা ভারতের অধীনে চলে যায়। আর সেই সেক্টরের পাকিস্তানী কমান্ডার একজন রণচতুর দুঃসাহসী বুদ্ধিমান ব্রিগেডিয়ার। ওয়াদী লেপপা ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়েছে, একথা সে ক্ষণিকের জন্যও মেনে নিতে পারছিল না। তাই সে গোপনে তার তৎপরতা অব্যাহত রাখে। আর এদিকে ভারতীয় জেনারেল তার ব্রিগেডিয়ারকে লেখা পত্রও ব্রিগেডিয়ারের হাতে এসে পৌঁছেছে। যে পত্রে জেনারেল ব্রিগেডিয়ারকে যে কোন মূল্যে ওয়াদী লেপপা দখল করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যার ফলে ভারতীয় বাহিনী সুউচ্চ পাকা মোর্চা প্রস্তুত করে এবং চোখ কান খোলা রেখে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। রাতের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবুহ্য ভেদ করে সকল নিরবতা নির্জনতার যবনিকাপাত করে পাহাড়ী লড়াকু দুঃসাহসী পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার কমান্ডার সর্বশক্তি নিয়ে ভারতীয় সেনা ছাউনীতে অতর্কিত আক্রমণ হানে। শুরু হয় তুমুল লড়াই। উভয়পক্ষের গোলা-বারুদের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠে ওয়াদী লেপপার পাহাড়-পর্বত। আতশ রোশনীতে আলোকিত হয়ে যায় ঘনঘোর আঁধার চাদরে মুড়ি দেয়া পাহাড়ী অঞ্চল, পশু-পাখি কিচির মিচির শব্দ করে দিক দিগন্তে উড়তে থাকে। এরই মাঝে ভেসে আসে আহত সৈনিকদের আর্তচিৎকার। আর এ রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলে সকাল পর্যন্ত। ভারতীয় গর্বিত বাহিনী পাক বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে এক হাজারের অধিক জওয়ান ও অফিসারের লাশ ফেলে পরাজয়ের বেদনাময় গ্লানি নিয়ে জীবন নিয়ে কোন মতে পালিয়ে যায়। ভারতীয় বাহিনীর নাপাক রক্তে রঞ্জিত হয় ওয়াদী লেপপার সবুজ প্রান্তর। ভারতীয় বাহিনীর হাজার হাজার লাশ মাড়িয়ে পাহাড়ী কাঁটা-গুল্ম ঝোপ-ঝাড় ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে সিংহ শার্দুল মুজাহিদরা পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় উড্ডীন করে হিলালী নিশান। এরই মাঝে নিকষ কৃষ্ণ আঁধারের বুক চিরে রাতের বিদায় বার্তা জানিয়ে পাহাড়চূড়ার উপর দিয়ে আকাশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় বিজয়ের রক্তিম সূর্য। সূর্যের

আলোতে উদ্ভাসিত হয় জন্মভূমির মায়ায় দীনের তরে নিবেদিতপ্রাণ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বৈজয়ন্তি উড্ডীনকারী চারশত শহীদের হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারা। তাদের নূরানী চেহারা দেখে বুঝার উপায় নেই যে, তারা আর আমাদের মাঝে নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে বহুদূরে। তাদের চেহারায় নেই বেদনা-বিষাদের লেশমাত্র। তারা পেয়েছে অনন্ত অসীম আরাম-আয়েশ ও শান্তির নাগাল। এভাবেই তারা লিখে যায় ইতিহাসের শ্বেত-শুভ্র ফলকে স্বর্ণালী হরফে নিজেদের অমর নাম।

ভারত অবাঞ্ছিত ও গ্লানিময় এ পরাজয়কে নীরবে মেনে নেয়। চারশত শহীদের বিনিময়ে অর্জিত ওয়াদী লেপপা আজও পাকিস্তানের দখলে আছে। চারশত শহীদের বীরত্বগাথা অমর ইতিহাসের স্মরণে পেশোয়ার ও নৌশেরোয়া ছাড়া কাশ্মীরের কয়েকটি রেজিমেন্টে নির্মাণ করা হয় লেপপা মেস। যেহেতু এ আক্রমণ অঘোষিতভাবে হাই কমান্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে হয়েছে, বিধায় অকল্পনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের পরও সিংহশার্দুল অকুতোভয় সৈনিকদের মেডেল দেয়া সম্ভব হয়নি। তথাপিও তাদের বীরত্বের কাছে পাক জনগণ চিরঋণী, যে ঋণ পাক জনগণ কিয়ামত পর্যন্ত শোধ করতে পারবে না। ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি একদিন লেপপা মেসে গিয়েছিলাম। লেপ্‌পা মেসের এক কামরা থেকে নাসীম বেগমের কণ্ঠে মনের মাধুরি মিশ্রিত হৃদয়কাড়া জাতীয় সঙ্গীতের সুর-লহরী ভেসে আসছিল–

হে খোদার পথের শহীদ

হৃদ্যতা ও প্রতিজ্ঞার মূর্তপ্রতীক

জন্মভূমির মুক্ত বাতাস

তোমাদের জানায় হাজার সালাম।

আমি দরজা নক করে সে কামরায় প্রবেশ করি। দেখি, একজন ক্যাপ্টেন রেকর্ড প্লেয়ারে এ ক্যাসেট লাগিয়ে রেখেছে। পরিচয় পর্বের পর সে আমাকে জানাল যে লেপ্‌পাযুদ্ধের সময় সে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ছিল এবং তার কোম্পানী এডভান্স পজিশনে ছিল। যখন তারা শত্রুদের হেভী মেশিনগানের রেঞ্জের আওতায় চলে যায় তখন আচমকা শত্রুদের পক্ষ থেকে গোলা বৃষ্টি শুরু হয়। আর এ গোলা বৃষ্টির কবলে পড়ে একশত সাইত্রিশ কোম্পানীর মধ্য হতে মাত্র পাঁচজন প্রাণে রক্ষা পায়, বাকীরা

সকলেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়। বেঁচে যাওয়া পাঁচজনের সে একজন। এই লোমহর্ষক কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়ে অশ্রুতে ভরে যায় তার দুটি আঁখি। তথাপিও সে বলতে থাকে, আপনি হয়তো বা বিশ্বাস করবেন না যে আমরা কেমন দুঃসাহসিকতার সাথে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। ভারতের বাংকার ওয়াদী পাহাড়ের চূড়ায় এবং উঁচু টিলায় নির্মিত ছিল। তাদেরকে পরাস্ত করার মত কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিকে গোলা বৃষ্টির মুখে পড়ে আমাদের এডভান্স গ্রুপ থেমে গেছে। আর ভারত যে কোন মুহূর্তে সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে। এমনই এক কঠিন মুহূর্তে বিজয়মালা ছিনিয়ে আনতে আমাদের কোম্পানীর কতিপয় জানবাজ নওজোয়ান ভারতীয় বাংকার পদানত করতে জীবন মরণের ঝুঁকি নেয় এবং গ্রেনেড নিয়ে পাহাড়ী দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদ এক স্থান দিয়ে সন্তর্পণে ক্রলিং করে সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যায় যেখানে ভারতীয় বাংকার নির্মিত ছিল। তাদের বহনকৃত গ্রেনেড পিন খোলার ৬ সেকেন্ড পর ফাটল। যার ফলে তাদের নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড ভারতীয় বাংকারের অনেক নিচে গিয়ে পতিত হল। আর এ কারণে ভারতীয় বাংকারের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি। অথচ ভারতীয় বাংকারে হেভী মিশিনগান ছাড়াও মর্টার গোলা বারুদ ও সশস্ত্র সেনাদল ছিল। এমতাবস্থায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় সেনা দল আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। তাই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে এবং চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করতে সাথীরা পরস্পর পরামর্শ করে নেয় যে, তাদের থেকে ভারতীয় বাংকারের দূরত্ব পরিমাপ করে গ্রেনেড পিন খোলে লিওয়ার থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি হটিয়ে গ্রেনেড দু'চার সেকেন্ড হাতেই রাখবে, অতঃপর ভারতীয় বাংকার লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে। এই প্রসেস কালে নির্দিষ্ট সময়ের ভুল বুঝাবুঝির কারণে আমাদের এক লড়াকুর হাতেই গ্রেনেড ফেটে যায়। যার ফলে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে শহীদ হয়ে যায়। বাকী পাঁচ সাথী নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে আঘাত হানে। গ্রেনেডের কারণে ভারতীয় বাহিনীর যদিও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি কিন্তু বাংকারে রক্ষিত গোলা বারুদ ফাটার কারণে ভারতীয় বাংকারে কিয়ামত ঘটে যায়। গোলা বারুদের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল পাহাড়-পর্বত। খসে পড়ে পাহাড়ের উপরিভাগ। জমিন থেকে দশ গজ উপরে লাফিয়ে উঠে ভারতীয় সেনাদের জ্বলন্ত লাশ। গোলা

বারুদের কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় ধরার ধূলি। এমনি মুহূর্তে আমাদের এক জওয়ান ভারতীয় জ্বলন্ত লাশের চাপায় পড়ে হারাল তার প্রিয় বাহু। আর সকাল বেলায় ওয়াদী লেপপা ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে পত পত করে উড়ল চাঁদ তারা খচিত পাকিস্তানী পতাকা। এ অতর্কিত আক্রমণে বিবেকশূন্য হয়ে ভারত অকল্পনীয় ক্ষতির পাহাড় মাথায় নিয়ে পালিয়ে যায়। আর ভারত এতে এত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, স্মৃতিপট থেকে ওয়াদী লেপপার নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে যায়। যার ফলে পরবর্তীতে তারা ওয়াদী লেপপা উদ্ধারকল্পে কোন অভিযান চালায়নি। আমি ক্যাপ্টেনের আবেগ উচ্ছ্বাসকে সাধুবাদ জানিয়ে মেস থেকে বেরিয়ে আসি বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ওয়াদী লেপপার শহীদদের স্মরণে নসীম বেগমের মাধুরী মিশ্রিত আকর্ষণীয় কণ্ঠে গাওয়া–

খোদার পথের শহীদ
সরলতা ও প্রতিরক্ষার মূর্তপ্রতীক
জন্মভূমির মুক্ত বাতাস তোমাদের
জানায় হাজার সালাম।

আমার কর্ণকুহরে বহুদিন পর্যন্ত অনুরণিত হল ।

কথা চলছিল জেনারেলদের ডায়েরি সম্পর্কে। ডায়েরির প্রতিটি পৃষ্ঠা কাঙ্ক্ষিত তথ্যে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের নিখুঁত প্ল্যান এবং ভারত সীমান্তে ভারতীয় সেনা বাহিনীর পজিশন। ভিন্ন ভিন্ন চার জায়গাতে একই সময়ে একযোগে আক্রমণ করার arrow আকারে প্রতিচিহ্ন, আক্রমণকারী সৈনিকদের তোপখানার কোর, ইনফেন্ট্রি ডিভিশনে পূর্ব নির্ধারিত ট্যাংক রেজিমেন্টের সংখ্যা, পরিপূর্ণ একটি ডিভিশন নিয়ে শিয়ালকোট ও লাহোর সেক্টরে একযোগে আক্রমণ ও সম্ভাব্য পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিরোধের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এ মানচিত্রে এবং এ সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজের বিস্তারিত বিবরণ দেখে আমি অনুধাবন করি যে, আমরা এখন ভারত কমান্ডের OPERATION ROOM -এ আছি। যেখানে যুদ্ধের সময় যাবতীয় রিপোর্ট থাকে। দলিল-দস্তাবেজের বর্ণনানুসারে ভারতের নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী উভয়েই করাচীকে তাদের গোলা বর্ষণের টার্গেট বানিয়েছে এবং সিন্ধু প্রদেশের সাথে পাকিস্তানের রাজপথ ও রেলপথের যোগাযোগ ছিন্ন করার পরিকল্পনা

করেছে। আর ভারতের IBORDERSE, BSF CURITY FORCE নিয়মিতভাবে সেনাবাহিনীর সাথে মিলেমিশে হায়দারাবাদ ও করাচীকে দখল করার প্রতিজ্ঞা করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পত্রযোগে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, যদি প্ল্যান অনুযায়ী আক্রমণ করা হয় তবে বিজয় ৮০% নিশ্চিত। যুদ্ধ জয়ের পর বিজিত এলাকায় সৈনিক গভর্নর নির্ধারণ করার জন্যে কয়েকজন জেনারেলের নামও উল্লেখ করা হয়। ডাকের মোড়কে নিয়মানুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ পত্রের সিল লাগানো হয়। আমি তখনই সাথীদেরকে এ সকল চিত্রের কপি তৈরিতে লাগিয়ে দেই এবং নকশারও কয়েক কপি প্রস্তুত করি বটে। কিন্তু প্রশান্তি অনুভব করতে পারছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম যে, হুবহু এ নকশার কপি করতে। আর হুবহু নকশা কিভাবে করতে হয় এ ব্যাপারে আমিও কিছু জানি না। আমার সাথীরাও না। আমি গভীরভাবে ভেবেচিন্তে পরিশেষে আল্লাহর নাম নিয়ে শহরের বইয়ের এবং নকশার দোকানে চলে যাই। সেখানে সকল স্থানের নকশা ছিল। তাদের কাছে আমি কাহিল সাগরের এক অপরিচিত দ্বীপ পাপানিউর নকশা চাই। যা অনেক খুঁজাখুঁজি করে বহু কষ্টে সেলসম্যান আমাকে দেয়। আমি তাকে বলি যে, আমার এর মত আরো ছয়টি নকশা দরকার। সেলসম্যান অপারগতা প্রকাশ করে বলে যে, আমাদের কাছে শুধুমাত্র এ একটি নকশাই ছিল। তারপর আমি তাকে বলি যে, তবে এ নকশা কপি করতে হলে যে কাগজের প্রয়োজন সে কাগজ আমি চাই। সম্ভবত সে ঐ কাগজের নাম TRACING PAPER বলেছিল। আমি ১২/১৪ ইঞ্চি মোটা এক রিম কাগজ খরিদ করি এবং বিভিন্ন প্রকারের পেন্সিল ও বিভিন্ন কালারের HILITER ও একটি বোর্ড এবং নকশা বোর্ডে লাগানোর জন্যে পিন খরিদ করে সাথীদের বাসায় ফিরে আসি।

কপি করার কাগজের রোল ছিল একদম পরিস্কার। ফলে তা নকশার উপরে আঁটসাট করে লাগানোর পর নকশা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি মেট্রিক পর্যন্ত জ্যামিতি পড়েছি। আর সেই প্রাথমিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই আমি নকশার দুই কপি প্রস্তুত করার দুঃসাহস করি। বিশ্বাস করুন, এটাই হলো আমার জীবনে নকশা তৈরির প্রথম প্রয়াস।

আমি কাঠের বোর্ডে প্রথম নকশা রাখি, তার উপর TRACING PAPER পিনের সাহায্যে খুব ভালভাবে ফিট করি। তারপর নকশায় আঁকা পাকিস্তান ও ভারতের কন্ট্রোল লাইন আল্লাহর নাম নিয়ে আঁকতে শুরু করি

এবং কয়েক ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এমন নিখুঁতভাবে নকশা TRACING PAPER-এ হুবহু নকল করতে সক্ষম হই যে এখন আর ধরার উপায় নেই, কোনটা আসল আর কোনটা নকল। কাগজে কালারে এবং লেখায় চমৎকার একটি নকশা ফুটে উঠে। কয়েক মিনিট বিরতির পর TRACING PAPER-এর সাহায্যে নকশার আরেকটি কপি প্রস্তুত করতে শুরু করি। এ আশাতীত সফলতায় আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তির কথা একদম বেমালুম ভুলে যাই। আমাদের এক সাথী প্রতি ঘণ্টা অন্তর আমাদেরকে চা বিস্কুট দিত। ফলে আমরা ক্লান্তি দূর করে সতেজ হয়ে যেতাম। আমার দুই নম্বর সাথী আমাদের জানাল যে, ছোট ক্যামেরার ফিল্ম সমাপ্তির পথে। আমি পুরাতন ফিল্মের রোলের লেখা ও কোম্পানীর নাম পড়ে দুই নম্বর সাথীকে বলি যে ক্লাট সারকাসে কোডক এজেন্সি এবং শোরুম আছে। সেখানে গিয়ে দেখ, হয়তো এই ফিল্ম সেখানে পেতে পার। আমি তাকে ফিল্মে লাগানো সিলও সাথে আনতে বলি। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার সাথী হাসতে হাসতে ফিরে আসে। সে শোরুমে এ সাইজের ৩২টি ফিল্মের সবকটি ফিল্ম খরিদ করে নেয়। তার সাথে ক্যামেরার জন্যে অতিরিক্ত ফিল্ম নিয়ে আসে।

আমরা সকলেই কাজে মগ্ন। কেউ বা শ্লেট দিয়ে একের পর এক কপি বানাচ্ছে, আর কেউ বা ক্যামেরা দিয়ে প্রতি পৃষ্ঠার দুটি করে ফটো তুলছে, আর আমি নকশার দ্বিতীয় কপি প্রস্তুত করছিলাম। যখন আমরা কাজ শেষ করি তখন রাতের অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে ডায়েরির প্রতি পৃষ্ঠার দুই কপি এবং ক্যামেরার সাহায্যে তোলা দুই কপি ফটোষ্ট্যাট। তাছাড়া তারাপুর ফাইলেরও দুই কপি এবং দুই কপি ফটোষ্ট্যাট আছে। আর নকশার হুবহু কপিও TRACING PAPER-এর সাহায্যে প্রস্তুত হয়েছে। কাজ শেষ হয়েছে, এখন চিন্তামুক্ত। তাই এবার আমরা ক্ষুধা ও ক্লান্তির কথা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করি। এহেন মুহূর্তে একজন বলে উঠে, ঘণ্টা ঘরের কাছেই মাঝারি সাইজের একটি রেস্টুরেন্ট সারারাত খোলা থাকে। আমি একজনকে খাবার আনতে বলি এবং অপরজনকে প্রথমজনের কোর দিতে বলি। এই ফাঁকে তাদের খাবার নিয়ে আসার পূর্বেই যশোবন্তের কাছে রিটার্ন পাঠানো সকল ফাইল নকশা এবং এ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ডায়েরি এবং ডাক পৃথক করে একটি থলেতে ভরে রাখি, আর পাকিস্তানে প্রেরণকারী ডাক নকশা ও ডায়েরির কপি এবং ফিল্ম রোল

পৃথক করে সব এক প্যাকেটে ভর্তি করি। আর আমার কাছে রাখার কপি ও নকশা পৃথক আরেক প্যাকেটে ভর্তি করি। যখন আমরা ভোজন পর্ব শেষ করি ততক্ষণে রাত গভীর হয়ে গেছে। যার ফলে আমি সাথীদের সাথেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাছাড়া যশোবন্তের কাছে ডাক ফেরত পাঠানোর সময়ও শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি একটি চিরকুটে তাকে আগামীদিন অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় চাউরি বাজার রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে বলি। আর সাথীদেরকে বলি যে, তোমরা ভোর বেলা ডাকের থলে এবং আমার চিরকুট এশুনাতের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

পরদিন সকাল বেলা যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে তখন আটটা বাজে। ততক্ষণে আমার দুর্ধর্ষ সাথীরা যশোবন্তের ডাকের প্যাকেট যশোবন্তের কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে আসে। আর আমি নাস্তা সেরেই হেটেলে ফিরে আসব এ মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই একটি কথা স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে উঠে যে, 'দশটা বাজতেই তো আমাকে ওয়ারলেসযোগে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে'। যেই ভাবা সেই কাজ। তাই ওয়ারলেস অপারেটরকে বলি, যোগাযোগকালে MESSAGE RECEIVED ALL OK লেখা ছাড়াও কোড মারফত JACK POT SEND MOST RELIABLE TO COLLECT ও ট্রান্সমিট করতে এ সংবাদ পাঠিয়েই আমি সোজা হোটেলে চলে আসি এবং লম্বা সটান হয়ে শুয়ে পড়ি। কারণ সন্ধ্যা বেলায়ই তো যশোবন্তের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং যশোবন্তের স্বপ্ন পূরণ করে আমার মাথার বোঝা হালকা করতে হবে।

আমি সন্ধ্যা বেলা হোটেল লকের থেকে টাকা নিয়ে ঠিক সাতটায় চাউরী বাজার রেস্টুরেন্টে পৌঁছে যাই। যশোবন্ত পূর্ব থেকেই সেখানে আমার অপেক্ষায় বসা ছিল। আজ তাকে খুব হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায়। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের আনন্দ এবং এ আনন্দ ভোগ করতে গিয়ে সে যে অপরাধ করেছে তার ভয়ভীতি চেহারায় স্পষ্ট ফুটে উঠা সত্ত্বেও সে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে। আমি তার অভূতপূর্ব সফলতায় মোবারকবাদ জানাই। এতেই সে বলতে শুরু করে, 'স্যার! জেনারেল সাহেব যেদিন ছুটি কাটিয়ে অফিসে আসে সেদিনই সে তার চিঠি পড়ে আমাকে তা টাইপিং করতে ডাক দেয়। আমি জেনারেল সাহেবের কাঙ্ক্ষিত ফাইল বের করার জন্যে আলমারি খুলি। তখন আলমারির চাবি তালায় ঝুলিয়ে না রেখে আমার পকেটে রেখে

দিই এবং টাইপ করার সময় তিনটি চাবিরই নকশা সাবানের উপর নিয়ে নিই। চাবির নকশা তো আমার কাছে ছিল বটে; তবে চাবি বানাতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই। চাবি মেকারের দোকানে গেলাম। তখন তারা নকশার চাবি বানাতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর অন্য আরেকটি দোকানে যাই। তখন সেই দোকানদার বলে, এমন কঠিন কাজ আমরা করি না। তুমি ছাত্তালাল মিঞাতে বশিরের গেরেজে যাও। আমি ছাত্তালা মিয়া খুঁজতে খুঁজতে বশিরের গ্যারেজে পৌঁছি। সে নকশা দেখেই জিজ্ঞেস করল, কে পাঠিয়েছে? আমি তো এমনিতেই ভয়ে ভীত-বিহ্বল ছিলাম। তাই বলি যে বড় সাহেব পাঠিয়েছেন। এ কথা শোনামাত্রই বশিরের যেন কিছু একটা মনে পড়ে গেল। তাই বশির বলে উঠে, আচ্ছা, বড় সাহেবের বুঝি আরেকটি আলমারি খুলতে হবে। আমি হ্যাঁ সূচক সম্মতিতে মাথা দোলাই। তখন বশির আমাকে নিয়ে গ্যারেজের পিছে চলে যায়। যেখানে রয়েছে লেদ ইত্যাদি মেশিন। দু'ঘণ্টার মধ্যে এই তিনটি চাবি বানিয়ে দিয়ে সে আমাকে বলে, বড় সাহেবকে বলবে যে, মালের থেকে আমার অংশটা যেন আলাদা করে রাখে। আমি কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে আসব। তুমি এখানে এসো না। মানুষ সন্দেহ করবে। আমি এই ভেবে খুবই চিন্তিত ও শংকিত ছিলাম যে, যে বড় সাহেবের কথা মনে করে ভুলক্রমে বশির আমাকে চাবি বানিয়ে দিল পরিশেষে যখন সে সব জানতে পারবে, না জানি তখন সে কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। তাই আমি চাবি নিয়ে ভোঁ-দৌড়ে এলাকা থেকে পলায়ন করি এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে ভবিষ্যতে আর কখনও ছাত্তালাল মিয়াতে যাব না।

শনিবার দিন অর্ধবেলা কাজ হয়। তাই অর্ধবেলার পর সকলে চলে যায়। তেমনি জেনারেল সাহেবও চলে যান। জেনারেল সাহেব চলে যাওয়ার পর আমি সকলের অগোচরে লুকিয়ে ভগবানের নাম নিয়ে জেনারেলের কামরায় ঢুকে পড়ি। চাবি সুনিপুণভাবে বানানো হয়েছে। তাই খাপের খাপ মিলে যায়। তালা খুলতে কোন প্রকার বেগ পেতে হয়নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ফাইল, ডায়েরি, নকশা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ঝটপট থলেতে ভরে কামরা থেকে বেরিয়ে আসলাম। এখন শুধুমাত্র বিপদের একটি ধাপ বাকি আছে। আর তা হচ্ছে আগামীকাল সোমবার অফিস টাইমের পূর্বে সকলে অফিসে আসার পূর্বে এবং জেনারেল সাহেবেরও পূর্বে আগেভাগে অফিসে গিয়ে সকল কাগজপত্র যথাস্থানে

সাজিয়ে রাখা। যশোবন্তের এ কাহিনী আমাকে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার বীরত্ব প্রদর্শন ও আমার থেকে বাহবা পাওয়া। আমিও তাকে বাহবা দিতে কোন প্রকার কার্পণ্য করিনি, বরং পর্যাপ্ত পরিমাণে তাকে বাহবা প্রদান করি এবং বলি যে, এমন সমস্যা সম্বলিত বিপদ-সঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ পথ যখন এত সহজে নিরাপদে পাড়ি দিতে পেরেছো তবে বাকী পথ অনায়াসেই পাড়ি দিতে পারবে।

আমি চুপ করে চা পান করছিলাম। আমার এ নীরবতায় যশোবন্তের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ফলে সে বলতে শুরু করলো, স্যার! আপনার কাজ তো আমি জীবন বাজি রেখে করে দিয়েছি। এখন আমার সু..মী.. এতটুকু বলেই থেমে যায় এবং জিজ্ঞাসু চাহনিতে আমাকে দেখতে থাকে। আমি নীরবভাবে তার আশা-নিরাশার দোলাচলে দুদোল্যমান অবস্থা দেখে মনে মনে পুলকিত হলাম। তাই আমি চুপ করে চা পান শেষ করি। আমার এক মুহূর্ত নীরবতা যশোবন্তের কাছে কয়েক শতাব্দীর মত মনে হল।

এশুনাত আমার বাহু ধরে মৃদুভাবে ঝাঁকি দিয়ে মিনতি করে বলল, স্যার! আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দেননি! তার একথা শুনে আমি মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলি, যশোবন্ত বাবু! তুমি আমার কাজ করেছ এখন আমি তোমার কাজ করে দিব। একথা শোনামাত্র যশোবন্ত আনন্দে নেচে উঠে এবং আমার সাথেই দাঁড়িয়ে যায়। রেস্টুরেন্টের বিল আদায় করে আমরা উভয়েই বাইরে বেরিয়ে আসি। আমি যশোবন্তকে আমার আগে আগে হাঁটতে বলি। অল্পক্ষণের মাঝেই আমরা যশোবন্তের প্রাসাদে পৌঁছে যাই। আমরা সুমির মাকে পিছনের কামরায় ডেকে নিয়ে যাই। ইতোপূর্বে যে যশোবন্ত সুমীর মার সামনে ভিজা বিড়ালের ন্যায় বসে থাকতো আজকে সে যশোবন্তের মুড আলাদা। সে বুক ফুলিয়ে কথা বলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথা চলে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয়, এখন অতিরিক্ত বিশ হাজার টাকা সুমির মাকে দিতে হবে। আর বাকি টাকা অনুষ্ঠানের দিন দিতে হবে। এরপর যশোবন্ত সুমির মার কাছে আবেদন করে বসল, আজ অনুষ্ঠান চলাকালে সমস্ত দর্শকের সামনে যশোবন্তের অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করতে। আমি বিশ হাজার টাকা যশোবন্তের হাতে তুলে দিলাম। আর যশোবন্ত তখনই তা সুমির মার হাতে গুঁজে দেয়। এরপর আর সুমির মার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তাই সুমির মা যশোবন্তের কথায় কোন আপত্তি তুলেনি। যশোবন্ত আমার কাছে আরো

দু'হাজার টাকার বায়না ধরল আর আমি তা তাকে দিয়ে দিই। টাকা নিয়ে যশোবন্ত সেখানেই বসে গেল। আর আমি ফিরে আসি। ফেরার পথে আমি গভীরভাবে ভাবতে থাকি যে, সোনা সম্পদ, নারীই হচ্ছে সকল ধ্বংসের মূল। এর সাথে যদি জন্মভূমির সাথে গাদ্দারীকেও মিলানো হয় তবে খুবই যুৎসই হবে।

পরের দুই দিন আমি কাজকাম ছাড়া একদম ফ্রিভাবে কাটাই। যশোবন্ত নিয়ম মাফিক ডাকের প্যাকেট মঙ্গলবার আমার সাথীদের হাতে সোপর্দ করে। সাথীরা সেই ডাক কপি করে তার কাছে ফেরত দেয়। এখন শুধু আমাকে আগামী বুধবারে ওয়ারলেসের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সংবাদ পাঠানোর অপেক্ষার পালা। বুধবার দিন কাক ডাকা ভোরেই আমি সাথীদের বাসায় চলে যাই এবং নির্দিষ্ট সময়ে ওয়ারলেস সেট অন করি। যোগাযোগ হওয়ার পর ডি.কোডে পাকিস্তান থেকে সংবাদ পাই যে, আগামী রবিবার সকাল এগারটায় এক স্পেশাল কুরিয়ার তার সাথীদের নিয়ে সবজিমণ্ডি রেলওয়ে স্টেশনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। সমস্ত ডাক তার হাওলা করতে হবে।

আমি সাথীদের সাথে শলা-পরামর্শ করে এই ফায়সালা গ্রহণ করি যে, জেনারেলের আলমারি থেকে অর্জিত নকশা ডায়েরি ও ফাইলের এক এক কপি ছাড়াও যশোবন্ত সম্পর্কিত সকল ছবিরও এক এক কপি নিজেদের কাছে রাখব এবং মিশনের শুরু লগ্ন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত নিজের কাছে রক্ষিত যাবতীয় কপিও পাকিস্তান পাঠিয়ে দিব। আমরা এ সকল কপি নিজেদের কাছে শুধুমাত্র এজন্য রাখতাম যে, রোদ-বৃষ্টি ঝড়ে সকল বাধা পেরিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জিত তথ্যভাণ্ডার যাত্রাকালে আল্লাহ না করুন কুরিয়ারের গ্রেফতারীর কারণে যেন তা নষ্ট না হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আমরা যেন তা দ্বিতীয়বার পাকিস্তানে পাঠাতে পারি। পূর্বের ন্যায় এবারও জেনারেলের আলমারি থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের এক এক কপি নিজেদের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। রবিবার দিন ডাক বহনকারী স্পেশাল কুরিয়ার কোথাও কোন সমস্যায় পড়ে আটক হলে আমাদের তথ্যগুলো যেন নষ্টের কবল থেকে রক্ষা পায়। অতীতের যাবতীয় পুরাতন ডাকের কপি পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদের কাছে কপির আধিক্যতা অযাচিত কোন বিপদের মুহূর্তে আমাদের Mobility কে খর্ব করতে পারে। আর ধরা পড়লে তা আমাদের বিরুদ্ধে এক অকাট্য

প্রমাণস্বরূপ হতে পারে। তাছাড়া আমাদের কষ্টার্জিত তথ্যের আলোকে শত্রু তাদের পরিকল্পনায় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এ ফায়সালার পর আমি সাথীদেরকে বলি, অতীতের পুরাতন যাবতীয় কপি সিরিয়াল মত পৃথক একটি প্যাকেটে ভর্তি করতে। সন্ধ্যা নাগাদ এ কাজ শেষ হয়। স্পেশাল কুরিয়ারের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সাথীদেরকে যশোবন্ত থেকে ডাক গ্রহণ ব্যতীত যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করতে বলে আমি হোটেলে ফিরে আসি।

যশোবন্তের অনুষ্ঠানের দিন তারিখ আগামী সপ্তাহের শনিবার বিকাল বেলা নির্ধারিত হয়েছে। আমি যশোবন্তের বাদ বাকি টাকাও পরিশোধ করে দিয়েছি। এখন দুই তিন দিন আমি একদম ফ্রি। এদিকে চাঁদের চৌদ্দ তারিখের আর মাত্র দু'দিন বাকি। এমতাবস্থায় আমি আগ্রা তাজমহল দেখার প্রোগ্রাম তৈরি করি। যেই প্রোগ্রাম সেই কাজ। তাই পরদিন সকাল বেলা আগ্রার উদ্দেশ্যে ট্রেনে আরোহণ করি। সীমাহীন সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এ ভ্রমণে আমার থেকে এমন কিছু ভুল সংঘটিত হয়ে যায়, যে ভুলের কথা যদি আজও ভাবি তবে একদিকে মুখ জুড়ে হাসি পায়, অপর দিকে ভুলের পরিণতির কথা ভেবে গা শিউরে উঠে। রেলের ভ্রমণে আমি থার্ডক্লাশের টিকিট করি। এর কারণ হচ্ছে, থার্ডক্লাশের যাত্রীরা ভীড়ের কারণে প্রত্যেকেই যার যার সিট ও লাগেজের ফিকিরে ব্যস্ত থাকে। অন্য যাত্রীর দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ থাকে না। ভাগ্য ভালো যে, আমি বগিতে জানালার পাশেই একটি সিংগেল সিট পেয়ে যাই। আমার সামনে সিঙ্গেল সিটে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ মাথায় তিলক লাগিয়ে উল্টো ধুতি বেঁধে বসে আছে। ট্রেন উল্কার বেগে বিদ্যুৎগতিতে চলছে। আগ্রা পৌঁছতে আর মাত্র আধা ঘণ্টা বাকি। এমন সময় ব্রাহ্মণ ঢাকনা যুক্ত একটি জল পাত্র বের করে হাতকে বৃত্ত বানিয়ে হাতে পানি ঢেলে পান করতে থাকে। এমতাবস্থায় তার পানি পান দেখে অযাচিতভাবে আমার ঘুমন্ত তৃষ্ণা জেগে ওঠে। তাই আমি ব্রাহ্মণকে বলি, 'মহারাজ! যদি কষ্ট না হয় তবে আমাকেও জল পান করার সুযোগ দিয়েন।' ব্রাহ্মণ জলপাত্র আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় আর আমি হাতকে বৃত্ত করে জলপান করার উদ্দেশ্যে হাতে জল ঢালি। তখন জল আমার হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেয়ে বইতে থাকে। ব্রাহ্মণ আমার এ দুরবস্থা দেখে মুচকি হেসে বলে, মহাশয়! আপনি পানপাত্রে মুখ লগিয়েই জল পান করেন। যেই কথা

সেই কাজ। আমি পানপাত্রে মুখ লাগিয়ে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করি এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পানপাত্র তার কাছে ফেরত দেই।

আমি জানালা দিয়ে বাইরের নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখে পুলকিত হচ্ছিলাম। আচমকা কয়লার স্ফুলিঙ্গ এসে আমার নাকে ঢুকে পড়ে। (ভারতে অধিকাংশ রেলের ইঞ্জিনই কয়লায় চলে)। এতে আমার হাচি এল আর অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আলহামদুলিল্লাহ। ব্রাহ্মণ এ আওয়াজ শুনে ঘুরে আমাকে দেখতে থাকে এবং রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করে– 'তুমি কি মুসলমান?' তার পানপাত্র ভ্রষ্ট হওয়ায় রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। এ অবস্থায় আমি কোন কিছু ভেবে না পেয়ে উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কানে কানে বলি যে, 'চুপ থাকেন'। এ বগিতে কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী জাসুস উঠেছে। শুধুমাত্র তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যই আমি এ শব্দ বলেছি। আমি দিল্লীর আইবি (Inteligence Bureau)-এর অফিসার। আর দিল্লী থেকেই তাদের পিছু নিয়েছি। ব্রাহ্মণ এ বক্তব্য শুনে হতবাক হয়ে আমাকে দেখতে থাকে। আমি ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না যে কি করতে কি হয়ে গেল। আমাদের উভয়ের অবস্থা একই। চিন্তার দোলা চলে দুদোল্যমান। এমতাবস্থায় গাড়ীর গতি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে রাজামন্ডি স্টেশনে এসে থামল। আর এটাই হচ্ছে আগ্রার মূল স্টেশন। আর সামনে আগ্রার ছাউনী। আমি রেলের বগি থেকে বাইরে নেমে আসলাম। তাজমহল দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। অবস্থা বেগতিক দেখে তাজমহল ভ্রমণের প্রোগ্রাম মূলতবী রাখলাম। এরই মাঝে অতিবাহিত হয়ে গেল কয়েক মিনিট। আর এ ফাঁকে ট্রেনও চলতে শুরু করলো। আর আমি দিল্লিগামী ট্রেনের অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে বসে গেলাম। দিল্লী ফেরার পথে আমি সেকেন্ডক্লাসের টিকিট কাটলাম এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই দিল্লীতে পৌঁছে গেলাম। দিল্লীতে ফেরার পথেও আমার অবস্থা ছিল বেসামাল। এ অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার ধকল সামলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। তাই চিন্তায় ও আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি অব্যাহত থাকল। পরিশেষে এ মসিবতের দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার পর মনে মনে ফায়সালা করলাম, আগ্রা যাওয়া ও তাজমহল দেখার প্রোগ্রাম দুই তিন মাসের জন্য ভুলে যাব। আমার তো জানা ছিল না যে আগামী কয়েক দিনের মাঝেই আমার সঙ্গীদেরকে এক জটিল মিশন সফল করতে আগ্রা যেতে হবে।

পরদিন সকাল দশটায় আব্দুল করিম আমার হোটেলে আসলো এবং বলল, কর্নেল শংকর আগ্রাতে দুইদিন কাটিয়ে গতকাল বিকাল বেলা ফিরেছে। রাতের বেলা নেশার ঘোরে বলছিল, আগ্রার পূর্বে গ্রেফতারকৃত পাক গোয়েন্দাদের ট্র্যাজেডির উত্তাপ এখনও ঠাণ্ডা হয়নি আর এরই মধ্যে নতুন করে দুইজন পাকিস্তানী গোয়েন্দা আবার আগ্রাতে গ্রেফতার হলো। হেড কোয়ার্টার থেকেই আগ্রা পর্যন্ত তার পিছু নেওয়া হয়েছে। সে ভারতীয় ইন্টিলিজেন্সের কুৎসা রটাচ্ছিল। তাকে গ্রেফতারের জন্যে যে স্থানে ফাঁদ পাতা হয় তা হচ্ছে রাজামণ্ডি স্টেশন থেকে কিছুদূরে আগ্রা যাবার পথে নির্মিত রেলওয়ে আউটার সিগন্যাল সংলগ্ন স্থান। পাক গোয়েন্দাকে গ্রেফতারকারী DMI (Directore Military Intiligence) এর লোকেরা রেলস্টেশন থেকে শুরু করে Safehouse পর্যন্ত রেল লাইনের পাশ দিয়ে তাকে দৌড়ায়।

এরপর আব্দুল করিম কাকুতি মিনতি শুরু করে দিল তার জন্য কিছু একটা করার জন্য। আমি তাকে প্রবোধ দিয়ে বললাম, অতি শীঘ্রই আমি তোমার জন্যে কিছু একটা করবো। এছাড়া প্রাসঙ্গিক আরও কিছু কথা বলে দুইশত টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে বিদায় করলাম।

নতুন করে পাক গোয়েন্দার গ্রেফতারীর খবর আমাকে হতবাক করে দিল। তাই আমি পড়িমরি বিদ্যুৎগতিতে সাথীদের বাসায় পৌঁছলাম এবং তাদেরকে এ দুঃসংবাদ শুনালাম। আমার সাথীরা ছিল টগবগে তরুণ, অকুতোভয় এবং জন্মভূমির ভালোবাসার আবেগ উচ্ছ্বাসে উজ্জীবিত। এ সংবাদ শুনার পর তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলল, এ সকল গোয়েন্দাদের মুক্ত করার জন্যে অনতিবিলম্বে আমাদের অপারেশন করা একান্ত দরকার। আমার তিন সাথী ছিল অবিবাহিত। তাদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো, স্যার! আমরা যেদিন ভারত প্রবেশ করেছি সেদিন দৃঢ় প্রতীজ্ঞা করেছি যে, আমরা জীবনের সর্বশেষ রক্ত ফোঁটাকেও জন্মভূমির সম্মান ও হেফাজতের জন্যে উৎসর্গ করবো। যারা গ্রেফতার হয়েছে তারাও আমাদের ভাই। নিশ্চিত তারাও একই প্রতীজ্ঞা নিয়েই ভারতে প্রবেশ করেছে। আমরা যদি তাদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হই, তবে তা আমাদের মিশন সফল করার চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। বরং বেশিই হবে। এবার চতুর্থ সাথী বলল, স্যার! আল্লাহ না করুন, যদি আপনি বা আমাদের কেউ গ্রেফতার হই আর বাকি সাথীরা জানতে পারে,

বন্দিদের কোথায় রাখা হয়েছে তখন কি আমরা হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবো? বন্দীরাও তো আমাদের লোকই। তাদের মুক্ত করতে আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়।

জবাবে আমি তাদেরকে বললাম, আমি তোমাদের এ আবেগ-উচ্ছ্বাসকে মূল্যায়ন ও সম্মান করি। কিন্তু আমাদেরকে তো আবেগের পাশাপাশি বিবেককেও কাজে লাগাতে হবে। এ বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র আমরা পাঁচজনই একে অপরের সম্পর্কে এবং তার মিশন সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমাদের এখানে শুধুমাত্র মিশন সফল করতেই পাঠানো হয়েছে। এরপরও যদি আমরা আমাদের সিনিয়রের বিনা অনুমতিতে বন্দি গোয়েন্দাদের মুক্ত করার ফায়সালা গ্রহণ করি তাহলে আমাদেরকে অপারেশনের পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। সর্বপ্রথম লক্ষ্য করতে হবে, সেই গোয়েন্দাদের দেখাশোনার জন্যে কতজন পাহারাদার নিয়োজিত এবং তাদের কাছে কি রকম অস্ত্র আছে। দ্বিতীয়ত ভারতের শত কঠোরতা সত্ত্বেও সে এ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যূহ ভেদ করে পলায়ন করতে সক্ষম হতে পারে। তৃতীয়ত পলায়ন করে সে কোথায় যাবে, পাকিস্তানের দিকে? সে রাস্তা তো পলায়নের সাথে সাথেই ভারত সরকার সিল করে দিয়েছে। তারপর পাহারাদারদের সাথে লড়াই ব্যতীত আমরা তাকে পাহারাদারদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবো না। আর লড়াই করতে গিয়ে হয়তো আমরা আহত হব, না হয় বন্দি হবো। এমতাবস্থায় আমাদের মিশন উলট-পালট হয়ে যাবে। আমি এভাবে তাদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে হোটেলে ফিরে আসি। আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি যে, তারা আমি চলে আসার পর সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আমার অনুমতি ব্যতীত, আমারই অজান্তে এ অপারেশন চালাবে।

পরদিন সকাল দশটায় আমার দুই নম্বর সাথী টেলিফোন করে কাঁপা গলায় বললো, তৎক্ষণাৎ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তার টেলিফোনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে, এমন কি ইমার্জেন্সী ঘটলো? আমি তাকে এগারটায় মোগল মহল রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে বলি। নির্দিষ্ট সময়ে আমি যখন রেস্টুরেন্টে পৌঁছলাম তখন দেখতে পেলাম সে বাইরেই আমার অপেক্ষা করছে। রেস্টুরেন্ট সবেমাত্র খুলেছে। আমি তাকে রেস্টুরেন্টের এক কোণার টেবিলে নিয়ে গেলাম। সে খুবই বিমর্ষ ও চিন্তিত

ছিল। যার কারণে তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছিল না। অতঃপর সে যা কিছু বললো তা শুনে আমার শরীরের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেল। সে বললো, গত রাত থেকে আমার তিন সাথী উধাও। সে আরও জানাল, সে রাত বারটা পর্যন্ত একথা মনে করছিল যে, তারা তিনজন রাতের শেষ শো দেখতে গিয়েছে। বারটার পরও যখন তারা আসলো না তখন রাজপথের খোলা হোটেলে অনেক রাত পর্যন্ত তাদের তালাশ করা হল। কিন্তু না, কোথাও তাদের পাওয়া গেল না। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অতঃপর সকালেও যখন তারা ফিরে এলো না তখন সে ভড়কে গেল। ভারতে অবস্থানকালে এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। আমার নির্দেশানুসারে শুধুমাত্র দুইজন করে তাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল। আর রাতের শেষ শো দেখা তো কঠোরভাবে নিষেধ ছিল। বাইরে যাওয়ার পূর্বে নিজের দুই সাথী একথা জানিয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল যে, তারা কেথায় যাচ্ছে এবং কখন ফিরবে। এখন অবস্থা হচ্ছে ভিন্ন দুইয়ের স্থলে তিনজন রাত আটটা থেকে লাপাত্তা। তারা বাইরে যাওয়ার পূর্বে আমার অনুপস্থিতিতে তাদের সিনিয়র আমার দুই নম্বর সাথীকে কিছু জানায়নি। আমার কথা মত দুই নম্বর সাথী তাদের সামান চেক করেছিল। চেক করে দেখা গেল, তারা তিনজনই তাদের পিস্তল অতিরিক্ত রাউন্ড গুলি ছুরি বিশিষ্ট বেগও তাদের সাথে নিয়ে গেছে।

নানা রকমের সংশয় সন্দেহে পেয়ে বসল। না বলে না কয়ে একদম চুপচাপ এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে পেলাম না। তারপর আমি অযথা এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সময় নষ্ট না করে দুই নম্বর সাথীকে সাথে নিয়ে তাদের বাসায় চলে আসলাম। এসে দেখি সবকিছুই জায়গা মত ঠিক আছে। ভেবে কুল পেলাম না, যে কি হতে কি হয়ে গেল। আর কেন এমন ঘটলো। আমি তাদের কামরা তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু এমন কোন কিছুই উদ্ঘাটন করতে পারলাম না যা তাদের লুকানোর কারণ উদ্ঘাটন করতে পারে। চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দুই নম্বর সাথীর কামরায় গিয়ে বসলাম। বারবার শুধুমাত্র একটি কথাই মনে হচ্ছিল, হয়তো বা তারা সিনেমার শেষ শো দেখতে গিয়েছে এবং ফেরার পথে স্বাভাবিক চেকিং করতে তাদের কাছে অস্ত্র পেয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর হয়তো বা আমাদের সকল গোপন ভেদই ফাঁস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র আমরা দু'জনই গ্রেফতার হব না,

আমাদের সকল মিশন এমনকি এই গুরুত্বপূর্ণ ডাকও শত্রুর হাতে পৌঁছে যাবে। যখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করি তখন আমাদের ভবিষ্যৎ আঁধার নিমজ্জিত দেখতে পেলাম। আমি ফায়সালা গ্রহণ করলাম, দ্রুত গতিতে ডাক ও অন্যান্য বস্তু। যেমন ট্রান্সমিটার, ক্যামেরা এবং আমাদের মূল পরিচয়পত্র বহন করে এমন যাবতীয় বস্তু এ ঘর থেকে স্থানান্তর করে হোটেলে নিযে যাব। এ চিন্তার সাথে সাথেই এটাও মনে হল যে, হারিয়ে যাওয়া তিন সাথীই তো আমার হোটেলের ঠিকানা জানে এবং হোটেল চিনে। বন্দি অবস্থায় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তারা যদি হোটেলের কথা বলে দেয়, তবে শত্রু সৈন্য তখনই হোটেলে হানা দিবে। এজন্য আমাকে ও দুই নম্বর সাথীকে নতুন একটি হোটেলে বন্দী হতে হবে। তাই কালক্ষেপণ না করে দুই নম্বর সাথীকে সকল আসবাবপত্র প্যাক করতে বললাম। এ সময় আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না এবং আমার ব্রেন কোন কাজই করছে না। এখন আমার একমাত্র ফিকির হল ডাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু এবং নিজের জীবন ও দুই নম্বর সাথীর জীবন রক্ষা করা। আমি দুই নম্বর সাথীর কামরায় খুবই অস্থির হয়ে পায়চারী করছিলাম এবং সাথীকে সকল আসবাব তড়িঘড়ি প্যাক করতে বলছিলাম। আমি ভাবছিলাম, এটা হচ্ছে সময়ের খেলা যে, আমরা আগে এ ঘর থেকে নিরাপদে বের হতে পারব না– ভারতীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী এ বাড়িতে প্রবেশ করবে। আমি যখন এ আশা নিরাশার দোলাচলে দুদোল্যমান ঠিক তখনই আমার দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল টাইম পেসের উপর। তার নিচে একটা কাগজ চাপা দেয়া দেখতে পেলাম। আমি তখনী সে কাগজ হাতে নিলাম। আর কাগজ হাতে নেয়ার পরই আমার চক্ষু ছানা বড় হয়ে গেল এবং ফেটে খুন বের হওয়ার উপক্রম। এ পত্র আমাদের সেই তিন সাথীর পক্ষ থেকে আমাকে ও আমার দুই নম্বর সাথীকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে। পত্রে তিন সাথীর স্বাক্ষর রয়েছে। পত্রের ভাষ্য হচ্ছে, আমরা তিনজন আয়াতে বন্দি পাকিস্তানী দু'জন গোয়েন্দাকে মুক্ত করার জন্যে দুর্গম ও বন্ধুর পথে যাত্রা করলাম। যদি দু'দিন পর্যন্ত ফিরে আসতে না পারি তবে একথা মনে করবেন যে, আমরা তিনজনই শত্রুর গুলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছি। অন্যথায় আমরা যদি জীবিত গ্রেফতার হই তবে আমরা সাইনাইড সংযুক্ত দাড়ি চিবিয়ে স্বীয় জীবন কুরবান করে দিব। তথাপি আমাদের গোপন রহস্য এবং আপনার সম্পর্কে কোন তথ্য শত্রুকে

দিব না। পত্রে তারা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার কারণে আমার কাছে এবং দুই নম্বর সাথীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এর সাথে এও লিখেছে যে, এই মুহূর্তে যদি আমরা এ অভিযান পরিচালনা না করতাম তবে আমাদের দেমাগ এই ভেবে নষ্ট হয়ে যেত যে, আমাদেরই দুইজন পাকিস্তানী ভাই আমাদের ন্যায় মিশন সফল করতে গিয়ে বন্দি হয়েছে এবং তাদের বন্দি করে রাখা ও নির্যাতন সেলের ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আমরা তাদের কোন প্রকার সহযোগিতা করছি না। তারা আরও লিখেছে, আপনি আমাদের অভিযান যেন সফল করতে পারি সেজন্য দোয়া করবেন এবং আমরা যদি ইহকাল ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমাই সে অবস্থায় আমাদের মাগফেরাত কামনা করবেন। জীবিতাবস্থায় আপনি বা কোর্টমার্শাল আমাদের এ অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করবেন তা অবনত মস্তকে মেনে নিতে সদা প্রস্তুত।

আমি দুই নম্বর সাথীকে ডেকে এ পত্র পড়তে বলি। এ পত্র আমাকে দ্বিগুণ চিন্তায় ফেলে দিল। অভিযান ব্যর্থ হলে সে অবস্থায় তাদের জীবন বিলিয়ে দেয়া গোপন ভেদ ফাঁস না করার যে প্রতিজ্ঞা তা তাদের আবেগ। পরবর্তীতে এ আবেগের বশবর্তী হয়ে প্রতিজ্ঞার কোনই মূল্যায়ন থাকে না। দুই নম্বর সাথীও পত্র পড়ে চিন্তায় ও পেরেশানীতে খেই হারিয়ে ফেলে। দুই নম্বর সাথী সারা ঘরময় সমস্ত বস্তু উলট-পালট করে তাদের সন্ধান করেছে। কিন্তু পেরেশানী ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় তার কামরায় রাখা টাইম পেসের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেনি। এ পত্র পাওয়া সত্ত্বেও আমি ও দুই নম্বর সাথী উভয়ে মিলে সমস্ত সামানা উঠিয়ে ছাত্তা লাল মিঞাতে এক সাধারণ হোটেলের দুই কামরায় নিয়ে রাখি। ঘরের দরজার চাবি এক পিস করে সকলের কাছে ছিল। কিন্তু তারা তিনজনই চাবি রেখে গেছে। বাড়ির মালিককে আমরা ঘরের চাবির এক সেট দিলাম এবং দুই নম্বর সাথী বাড়ির মালিককে জানাল যে, আমার সাথীরা বিশেষ এক কাজে দিল্লীর বাইরে গিয়েছে এবং তাড়াহুড়ার কারণে চাবি নিতে ভুলে গেছে। আমাকেও এক পার্টির মাল ডেলিভারি দেয়ার জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে। আমার ফিরার পূর্বে যদি সাথীরা ফিরে আসে তাহলে তাদেরকে চাবিটা দিবেন।

ছাত্তা লাল মিঞা থেকে আমি সরাসরি হোটেলে গেলাম এবং নিজের দুই চার জোড়া কাপড় সুটকেসে ভরলাম। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও সমুদয় টাকা হোটেল লক থেকে বের করলাম। সাইলেন্সার বিশিষ্ট পিস্তলও

সুটকেসে ভরলাম এবং হোটেল ব্যবস্থাপককে 'আমি দুই এক দিনের জন্যে দিল্লীর বাইরে যাচ্ছি'– বলে হোটেল থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

তারপর ছাত্তা লাল মিঞাতে নিরাপদেই পৌঁছে গেলাম ঠিকই তবে বাকি দিন ও রাত জেগেই কাটালাম। মনে হচ্ছিল যেন কোন এক বিরাট ভূমিকম্পের কারণে সকল কিছুই উলট-পালট হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতা তো পরের কথা আমরা উভয়ে শুধুমাত্র একথা ভাবছিলাম যে, কি করে এ ডাক আগমনকারী কুরিয়ারের কাছে পৌঁছাবো। আমার দুই নম্বর সাথী মতামত ব্যক্ত করল, এই মুহূর্তে আমাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে ট্রান্সমিটারযোগে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করা দরকার। যা আমি তখনই বাতিল করে দিলাম একথা ভেবে যে, ভারতে সিভিল ও গোয়েন্দা সংস্থা মেজর আহসান ও তার সাথীদের গ্রেফতারের পরই সতর্ক হয়ে গেছে। তারপর এখন আবার নতুন দুই গোয়েন্দা গ্রেফতারের পর তারা রেড এলার্ট অবস্থায় আছে। এমতাবস্থায় ট্রান্সমিটারযোগে লম্বা পয়গাম পাঠানো মানে গোয়েন্দা সংস্থাকে নিজের ঠিকানা নিজে বলে দেয়ার নামান্ত র। দুই নম্বর সাথী মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে এও বলল যে, তারা যদি অভিযান সফল করে ফিরেও আসে তথাপি নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার কারণে তাদেরকে কুরিয়ারের সাথেই ফেরত পাঠাতে হবে। আমি তাকে বললাম, বর্তমানে চুপচাপ অপেক্ষা কর এবং দেখেশুনে কাজ কর। (Wait and see) এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এ গুরুত্বপূর্ণ ডাক পাকিস্তান পাঠানো। তারা যে অপরাধ করেছে তা আবেগের বশবর্তী হয়ে করেছে যা অমার্জনীয় অপরাধ। জীবন বাজি রেখে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। আমার এও ভয় হচ্ছিল, তাদের নিরাপদে অপারেশন সফল করে ফিরে আসার পর তাদেরকে যদি পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিই, তারা না জানি কোর্ট মার্শালের ভয়ে রাস্তা থেকেই পলায়ন করে। তারা তো পত্রে তাদের আবেগ উল্লেখ করে তাদের জ্ঞানে তাদের অভিযানকে বৈধ করে নিয়েছে। কিন্তু আমার জন্যে এক বিশাল সমস্যার পাহাড় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপদে তাদের প্রত্যাবর্তন অন্যথায় ফিরে আসার জন্য পত্রে তাদের লেখা নির্দিষ্ট সময় দুই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর তাদের ব্যাপারে পাকিস্তানকে অবগত করার ফায়সালা করি। আর এ দীর্ঘ সময় শেষ পর্যন্ত রবিবারে গিয়ে ঠেকল। স্পেশাল কুরিয়ার যেদিন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন

আমরা পাঁচজনের মধ্যে মাত্র দুইজন বাকি। আমি দুই নম্বর সাথীকে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা শান্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একে অপরকে কোর করব এবং কখনও একা বাইরে যাব না।

পরদিন সকাল দশটার দিকে আমরা উভয়েই হাঁটতে হাঁটতে তাদের বাসার সামনের সড়কে গেলাম। ঘটনাক্রমে কাকতালীয়ভাবে বাড়ির মালিকের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। সাক্ষাতে বাড়ির মালিক আমার দুই নম্বর সাথীকে জানাল, তারা তিনজন সকাল বেলা বাসায় এসেছে। আমরা প্রায় দৌড়েই বাসায় পৌঁছলাম। দেখলাম তারা ঘুমিয়ে আছে। দুই নম্বর সাথী তাদেরকে জাগাল। এমতাবস্থায় আমাকে ও দুই নম্বর সাথীকে দেখে তারা এমন ভড়কে গেলো যে চক্ষু মেলার হিম্মত পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। যার ফলে তারা চক্ষু মেলে তাকাতে সাহস করছিল না। আমি তাদেরকে স্বাভাবিককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, ইতোপূর্বেই তোমাদের পত্র পেয়েছি। অতএব ভূমিকা না টেনে বাসা থেকে যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী বিস্তারিত বল। শুধুমাত্র একজন উত্তর দিবে, বাদবাকি সকলেই চুপ থাকবে। এটা শুনে আমাদের সেই সাথী উঠে দাঁড়াল, যে কারাতে কংফুতে দক্ষ ছিল এবং বলতে শুরু করলো–, 'স্যার! আমাদের থেকে একটি বিরাট ভুল হয়ে গেছে যা আমরা করেছি।' আমি তাকে ভেটো দিয়ে বললাম, আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি শুধুমাত্র তার জবাব দাও। ভুল হয়েছে কি না তা পরে হবে।

স্যার! আপনি চলে যাওয়ার পর আমরা ফায়সালা করলাম, আগ্রাতে বন্দি পাকিস্তানী দুইজন গোয়েন্দাকে মুক্ত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি এ কাজে অনুমতি দিবেন না। তাই আমরা ফায়সালা করলাম, এ কাজ আপনার অজান্তেই করব। ফলে আমরা তিনজনই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রেল স্টেশনে গেলাম। তারপর রাত এগারটায় আগ্রাগামী ট্রেনে উঠে বসলাম। এটা একটি যাত্রীবাহী ট্রেন। প্রতিটি স্টেশনেই স্টপেজ করে এবং অন্য ট্রেন পাস করে তারপর ছাড়ে। এভাবে সারারাত কাটিয়ে সকাল বেলা রাজামন্ডি স্টেশনে পৌঁছলাম। আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। Sefe House-এর যে নকশা আপনি বলেছিলেন সে অনুযায়ী সেদিকে যাত্রা করলাম। আমরা মনে করেছিলাম, সারা দিন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে রাতের বেলা তাদের মুক্ত করার জন্যে কমান্ডো স্টাইলে আক্রমণ করার চেষ্টা করবো। রেল স্টেশন থেকেই

রেল লাইনের পাট বিছানো রয়েছে যা আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছে। সেফ হাউজের সামনেই রেল লাইনের অপর দিকে এক কাঁচা বস্তি রয়েছে। সেখানে অনেক মানুষের জটলা দেখলাম। যারা সেফ হাউজের দিকে ইশারা করে বিভিন্ন কথা বলছিল। আমরাও এর মধ্যে শামিল হয়ে গেলাম। সেফ হাউজের সামনে কয়েকটি সামরিক জীপ এবং এম্বুলেন্স দণ্ডায়মান ছিল। মিলেটারিরা কাউকে সেফ হাউজের দিকে যেতে দিচ্ছিল না। বস্তিবাসীর অনেকেই নিজ ঘর থেকেই দূরবর্তী সেফ হাউজ দেখছিল। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলল। প্রত্যেকেই যার যার কাল্পনিক মতাদর্শে ঘোড়া দৌড়ায়। কিন্তু কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারল না যে মূলত কি ঘটেছে।

এম্বুলেন্স ও জীপের উপস্থিতিই জানান দিচ্ছিল কোন সিনিয়র অফিসার আগমনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। মিলিটারীরা রেল লাইনের অপর প্রান্ত থেকে মানুষদের যার যার ঘরে যাওয়ার জন্যে হাঁক দিচ্ছিল। কিন্তু তারা রেল লাইন পার হয়ে বস্তিবাসীদের বলপূর্বক ঘরে প্রবেশ করাতে পারছিল না। (সম্ভবত এর কারণ ভারতে মার্শালশ' না থাকা এবং সেনাবাহিনীকে শহরের কাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিধি রয়েছে। অবাধে কাজ করার অধিকার নেই।) এরই মাঝে রেল লাইনের পয়েসম্যান তার উর্দি পরে বস্তিতে প্রবেশ করে। তাকে প্রবেশ করতে দেখে সমস্ত মানুষ চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং ঘটনা সম্পর্কে জানতে চায়। জবাবে সে বলল, আমি রাত তিনটার দিকে ডিউটিতে যাওয়ার জন্য বের হই। বের হওয়া মাত্রই সামনে অবস্থিত সেফ হাউজের ভেতর বাইর থেকে একযোগে গুলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ইতোপূর্বে আমি তো সেফ হাউজ সম্পর্কে কোন কিছুই জানিনি। আমি শুধু এতটুকু জানতাম যে, এ ঘরে কিছু সংখ্যক সৈনিক থাকে। কখনও কখনও এ ঘর থেকে চিৎকারের আওয়াজও শুনতে পেতাম বটে এবং সচরাচর জীপে আরোহণ করে সামরিক অফিসারদেরও যাতায়াত করতে দেখতাম। এ ঘরের ভেতরে এবং বাইরে নরমাল পাওয়ারের লাইট জ্বলছিল। এ লাইটের আলোতে দেখতে পেলাম, সামরিক উর্দি পরিহিত তিনজন লোক ঘরের বাইরে গুলি খেয়ে মরে আছে। আর ঘরের ভেতর থেকেও অবিরাম গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। অবশেষে যখন গুলাগুলি থেমে নীরব হয়, তখন সাধারণ শহরের পোশাক পরিহিত পাঁচজন ব্যক্তি তন্মধ্যে দু'জন বাকিদের উপর ভর দিয়ে সেফ হাউজ থেকে বের

হতে দেখলাম। তাদের অনতিদূরেই মোটর সাইকেল দাঁড়ানো ছিল। তারা সকলে গিয়ে সেই মোটর সাইকেলে উঠে এবং বিদ্যুৎগতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে রাজপথে হারিয়ে যায়।

এসব কাণ্ড কারখানা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যার ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই পড়িমরি করে দৌড়ে কোন মতে স্টেশনে পৌঁছে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করলাম এবং যথারীতি ডিউটিতে লেগে গেলাম। আমি দুই নয়নে যা কিছু দেখেছিলাম তার কারণে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরি। আমাকে যদি এ ব্যাপারে সেনা বাহিনী কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে আমি তাদের কাছে কোন প্রকার জবানবন্দি দিব না। খামোখা নিজের কাঁধে এ মসিবত কেন টেনে আনবো। পয়েসম্যানের জবাব শুনে উপস্থিত জনতা পুনরায় পর্যালোচনায় লেগে গেল। ক্ষাণিক পরই একটি জীপ আসলো। সেই জীপে এক স্টার লাগানো ছিল। নিশ্চিত যে, এতক্ষণ এই ব্রিগেডিয়ারেরই অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তিনি জুনিয়ার এক অফিসারকে সাথে করে সেফ হাউজের অন্দরে যান। অল্পক্ষণ বাদেই বেরিয়ে আসেন। তার জুনিয়র অফিসারদের সাথে কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলেন এবং এক সময় গাড়ি নিয়ে চলে যান।

পয়েসম্যানের বক্তব্য অনুসারে তিন সৈনিকের লাশ যা বাইরে দেখা গিয়েছিল তা আমাদের সেখানে পৌঁছার পূর্বেই এম্বুলেন্সে রেখে দেয়া হয়েছে। সূর্যের আলোতে আমরা দেখতে পেলাম, তাদের লাশের স্থলে চুনা দিয়ে লাশের পজিশন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেফ হাউজের ভেতর থেকে তিন সৈনিকের লাশ এনে আমাদের সামনেই এম্বুলেন্সে রেখে দেয়া হল। সেফ হাউজে তালা লাগিয়ে দুই সৈনিককে পাহারায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর প্রথমে এম্বুলেন্স ও পরবর্তীতে একে একে সবক'টি জীপও সেখান থেকে চলে যায়। এমতাবস্থায় সেখানে অবস্থান করা বেকার এবং বিপজ্জনক বিধায় সে পথ ধরেই আমরা রাজামণ্ডি স্টেশনে চলে আসলাম। স্টেশনে সাদা পোশাকে বহু সংখ্যক সেনা সদস্য ও অফিসার। তারা যে সামরিক গোয়েন্দা তা তাদের হেয়ার কাটই (চুল কাটিংয়েই) বুঝা যাচ্ছে। গোয়েন্দার সন্ধানে কুকুরের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। আমরা দিল্লীর পরিবর্তে আম্বালার টিকেট কেটেছিলাম বটে; কিন্তু প্লাট ফরমে সৈনিকদের জিজ্ঞাসাবাদের কবল থেকে রেহাইয়ের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এহেন মুহূর্তে একটি অভিনয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল। 'আমি সন্ত

র্পণে চুপি চুপি আমার হাতঘড়ি খুলে পকেটে রাখলাম এবং একজন ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে তাকে নমস্কার করে সময় জানতে চাইলাম। জবাবে সে সময় বলে দেয়। তারপর আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, আম্বালাগামী ট্রেন কখন আসবে? রাগতস্বরে সে বলে, রেলওয়ের কারো কাছে জিজ্ঞাসা কর। আমি কি জানি যে গাড়ি কখন আসবে? ট্রেন তো প্লাট ফর্মেই দাঁড়ানো ছিল। তথাপি আমি রেলওয়ের এক কুলির কাছে জানতে চাইলাম গাড়ি কখন আসবে। তারপর আমার সাথীদের নিয়ে সেই ক্যাপ্টেনের পাশ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে ক্যাপ্টেনকে দ্বিতীয়বারের মত নমস্কার করলাম। ক্যাপ্টেন তো প্লাটফর্মের এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। আর বাকী সৈনিকরা বিক্ষিপ্তভাবে প্লাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আমাকে ক্যাপ্টেনের সাথে এক দেড় মিনিট কথা বলতে দেখে সৈনিকেরা আমাকে তার পরিচিতজন মনে করেছে। যার সুবাদে আমরা বিনা জিজ্ঞাসাবাদে নিরাপদেই এক বগিতে উঠে বসলাম এবং দিল্লীতেও পৌঁছে গেলাম। বাকি রাত আমরা ওয়েটিং রুমেই কাটালাম। কেননা স্টেশনে সৈনিকেরা চেকিং করছিল। আমাদেরকেও তারা জিজ্ঞাসা করে। জবাবে আমরা বলি যে, রাজামণ্ডি থেকে ট্রেনে এসেছি আম্বালা যাব। যে ট্রেনে আমরা এসেছি তা যেহেতু শুধুমাত্র দিল্লী পর্যন্ত যাবে, সামনে আর যাবে না তাই আম্বালা গামী ট্রেনের অপেক্ষা করছি। আমরা তাদেরকে টিকেট দেখিয়ে শান্ত করে দেই। তারা সামনে চলে গেল। এখানে এসে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, আপনার অনুমতি ব্যতীত আমাদের এ কাজ অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে। তাই ভয়ে কাচুমাচু হয়ে বাসায় পৌঁছলাম। আমরা সবকিছুই বলে দিলাম। আমরা আমাদের ক্ষমা অযোগ্য ভুল ভালো করেই বুঝতে পেরেছি। আমরা আমাদের এ অন্যায় কাজের দরুন লজ্জিত। আপনি আমাদেরকে যে শাস্তি ই দিবেন সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিব।

আমি তাদেরকে বললাম, শাস্তির ব্যাপারে তো পরে কথা বলব। এখন তোমরা দুইজন আমার ও দুই নম্বর সাথীর সাথে চল। একজনকে বাসায় রেখে আমরা চারজন ছাত্তা লাল মিঞাতে আসলাম। হোটেলওয়ালাদের কাছ থেকে হিসাব করে সব মালামাল ফেরত নিলাম। তারপর প্রথমে তাদের বাসায় গেলাম। সেখান থেকে আনা যাবতীয় সামান দুই নম্বর সাথীকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি লুধি হোটেলে চলে আসলাম। আমার সাথে মাত্র একটি স্যুট ছিল। কামরায় পৌঁছে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়

করলাম। যে মহামহিম মরণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। (পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার পর জানতে পারলাম, আগ্রাতে বন্দিদের গ্রুপও পাঁচ সদস্যের ছিল। এরা পাঁচজনই দুই তিন জনের টুলে আগ্রা ছাউনীতে তাদের টার্গেট শিকারের চেষ্টা করছিল। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এআইইউ-এর লোকেরা দুইজনকে গ্রেফতার করে ফেলে এবং ডিএমআই-এর হাতে ন্যস্ত করে। বাকি তিনজন দূর থেকে এসব কর্মকাণ্ড দেখছিল। তাদের গ্রুপ লিডারও বন্দিদের মাঝে ছিল। বাকি তিনজন পৃথক পৃথকভাবেই তাদের পিছু নেয় এবং তারা সেদিন বিকাল বেলা সেফ হাউজ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। তারপর চারদিন পর্যন্ত বন্দি সাথীদের মুক্ত করার ব্যাপারে কলা-কৌশল রপ্ত করতে থাকে।

এরই মাঝে বন্দী সাথীদের উপর মোটামুটি নির্যাতনও চালানো হয়। বাকি তিন সাথী পরিশেষে কমান্ডো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেদিন সকালে আমার সাথী সেখানে পৌঁছেছিল, সেদিনই তারা কমান্ডো আক্রমণ করে সেখানে কর্তব্যরত ভারতীয় ছয় সৈন্যকে মৃত্যুর চাদর পরিয়ে তাদের বেষ্টনী থেকে সাথীদের মুক্ত করে নেয়। তাদের চলার বাহন মোটর সাইকেলও সেদিন রাতেই গান পয়েন্ট থেকে ছিনতাই করা হয়। তারপর আগ্রা স্টেশনের নিকটেই কোন এক স্থানে তা রেখে তারা প্রথমে লখ্নো তারপর ভারত-নেপালের চড়াই-উৎরাই বন্ধুর পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে বর্ডার ক্রস করে নেপালে প্রবেশ করে এবং কাঠমাণ্ডু থেকে পাক দূতাবাসের সার্বিক সহযোগিতায় প্রথমে মালয়েশিয়া পরবর্তীতে নিরাপদে পাকিস্তান পৌঁছে। পরদিন ভোর বেলায়ই আমি সাথীদের বাসায় চলে গেলাম। আমি রাতের বেলাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সীমাহীন হঠকারিতা ছাড়া তাদের অপতৎপরতা সম্পর্কে পাকিস্তানে কোন রিপোর্ট পাঠাবে না। একে তো আমার নিজের অবস্থা নাযুক। তাছাড়া শত্রুদেশে তাদের দ্বারা কাজ নেয়া এবং কোন অথরিটির ভিত্তিতে তাদের উপর কর্তৃত্ব চালানো এবং নীতিবাক্য বলে যদি তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ না করা যায় তবে তা হবে বড়ই কঠিন কাজ।

আমি অধিকাংশ সময়ই তাদের সাথে বন্ধু পরিবেশে কথা বলতাম এবং ব্যক্তিগতভাবেই তাদেরকে হ্যান্ডল করতাম। এখনও আমি তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবেই মিলতে চাচ্ছিলাম। কোন একদিন তাদের চারজনকে ঘরের এক কামরাতে একত্র করলাম এবং বললাম যে, আপনাদের

কর্মতৎপরতায় আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনারা আমার উপর অসন্তুষ্ট। আমরা সকলেই দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করেই জীবন বাজি রেখে এখানে এসেছি। আমাদের সকলের সার্বিক প্রচেষ্টায় মহান আল্লাহ আমাদেরকে অসাধারণ কল্পনাতীত বিজয় দান করেছেন। আর এ বিজয় হচ্ছে সম্মিলিত কাজের ফল। প্রত্যেক টিমেরই একজন নকীব থাকে। তেমনিভাবে আমিও আমার টিমের গ্রুপ-লিডার। আপনাদের চাল-চলনে আমি অনুধাবন করতে পারছি, একজন গ্রুপ-লিডার হিসেবে সে অনুযায়ী আমি এখন আপনাদের থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি না। তাই আমি ফায়সালা করেছি, আগামী রবিবারে পাকিস্তান থেকে আগমনকারী কুরিয়ারের সাথেই আমি পাকিস্তান ফিরে যাবো। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের নতুন গ্রুপ লিডার না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দুই নম্বর সাথীর নির্দেশে কাজ করবেন। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করছি, আপনাদের তৎপরতা সম্পর্কে আমি সিনিয়রকে কোন কিছু বলবো না। একথা বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম। তারা চারজন প্রথমে তো বিস্ময়ে চুপচাপ। আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরে সমস্বরে বলে উঠল– না স্যার! কখনও এমনটি হতে দিব না। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে দিব তবুও আপনাকে ফিরে যেতে দিব না। আপনি যত চান আমাদেরকে শাস্তি দেন, তবুও আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। যদি আপনি ফিরে যান তবে আপনার পিছে পিছেই আমরাও পাকিস্তান ফিরে যাবো। যদিও বা সেখানে আমাদের মৃত্যুদণ্ডই দেয়া হোক না কেন। এসব প্রত্যয় তারা সমস্বরে ব্যক্ত করল। তাদের ধারণাও ছিল না, তাদের তৎপরতা... এবং আমার মিশন অপূর্ণাঙ্গ রেখে নিজে পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার অপরাধে শাস্তির শিকার হব। যখন তাদের কাকুতি মিনতি বেড়ে গেল তখন আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা সেনা বাহিনীতে ভর্তির সময় একবার শপথ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার ভারত আসার পূর্বে। এখন আমি আপনাদেরকে শপথ করাব না। শুধুমাত্র এ কথা জানতে চাই অদূর ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কোনোদিন করবেন না। তারা সকলে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে মাতা-পিতার নাম নিয়ে এমনভাবে অঙ্গীকার করল যে যা শুনে আমি কেঁপে উঠি। আমি কখনও তাদের থেকে এমন অঙ্গীকার প্রত্যাশা করিনি। ক্ষাণিক পূর্বের পরিবেশ এখন আমূল পরিবর্তন হয়ে

গেছে। সকলের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত। আমি একে একে সকলের সাথেই মুআনাকা করলাম।

এদিকে বর্ষাকাল থাকায় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এমনই এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে তারা চায়ের ব্যবস্থা করে। চা পান করার পরই খাবারের সুঘ্রাণ পেলাম। তাই এর উৎস সন্ধান করছিলাম। এরই মাঝে দেখি, বাড়ির মালিক বড় বড় দুইটি খাজাঞ্চিতে করে চার পাঁচ প্রকারের খাবার ও বিরানী নিয়ে আসছে। সিঁড়িতে দণ্ডায়মান তার মেয়ে খাবারের ট্রে ধরে আছে এবং মালিক তা ভিতরে আনছে। আমি ভেবে হয়রান হচ্ছিলাম যে হঠাৎ এ মেজবানীর হেতু কি? সকল সংশয় ও পেরেশানী দূরীভূত হয় বাড়ির মালিকের কথায়। আমার বড় মেয়ের বাগদান চূড়ান্ত হয়েছে। এ শুভ কাজে ও নিকট আত্মীয়দের দাওয়াতে ভাড়াটিয়াদের শরীক না করা সমীচীন নয়। তাছাড়া প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের ভাষ্য হচ্ছে, কোন এক স্থানে নবী করীম (সা.) প্রতিবেশীদের অধিকার বর্ণনা করছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন যে, নবী করীম (সা.) প্রতিবেশীদের এমন বেশি অধিকার বর্ণনা করেন, আমার মনে হচ্ছিল তারা না জানি ওয়ারিস হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে ঐশী বিধান অবতীর্ণ হয়ে যায়। আমি বাড়ির মালিককে তার মেয়ের বাগদানের মুবারকবাদ জানাই এবং সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার পরিবেশনের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তারপর সাথীদের সাথে পরামর্শক্রমে ফায়সালা করি, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পাঁচজন আমাদের সকলের পক্ষ হতে পাঁচ সেট বেনারসী বাড়ির মালিকের মেয়ের বাগদানে উপহার দিব। এভাবেই আমরা গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিলাম সারা বেলা। সকাল বেলা অনুষ্ঠানে যে বৈরিতা ছিল তা এখন শেষ হয়ে গেছে এবং সেই বৈরিতার স্থান দখল করেছে মনোরম ও বিশ্বস্ততার নতুন এক পরিবেশ।

যশোবন্ত নিয়মানুযায়ী ডাক সরবরাহ করছিল। আগামী রবিবার পর্যন্ত আমি ফ্রি থাকায় কর্নেল শংকরের সাথে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করলাম এবং বিকাল বেলা কর্নেল শংকরের বাহারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। আজ কর্নেল শংকরের অনুষ্ঠানে নতুন একজন অতিথিকে দেখতে পেলাম। কর্নেল শংকর আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় ও তার পাশে বসা নতুন অতিথির সাথে আমাকে পরিচয় করান যে, তিনি আগ্রা ছাউনীতে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। জরুরি এক কাজে হেড কোয়ার্টারে

এসেছেন। কর্নেল শংকরের অনুষ্ঠান যখন মদ পানে সরগরম এমতাবস্থায় কর্নেল নিশার ঘোরে দুলতে দুলতে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ওয়ানুদ! যদি তুমি তোমার উত্তম চায়ের পেডী নিরাপদ কোন এক স্থানে বিশ্বস্ত একজনের কাছে রাখ আর তার থেকে যদি সেই পেডী হারিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তুমি জানতে পার যে, তোমার বিশ্বস্ত লোক একজন বেপরোয়া ও উদাসীন লোক তবে এ বোকামীর দোষ তুমি নিজেকে দিবে না সেই বেপরোয়া উদাসীন লোককে? আমি ভেবে চিন্তে জবাব দিলাম যে, নিশ্চিত দোষী নিজেকে সাব্যস্ত করবো। কেননা, যে ব্যক্তির নিকট আমি চায়ের পেডী রেখেছি আমার উচিত ছিল তার ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করা। একদম ঠিক, আর একথাটিই আজ আমি কর্নেল রঞ্জিতকে কয়েকবার বুঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই তার দেমাগে প্রবেশ করেনি। Nothing can be put in the breain of this square headed person. কর্নেলের এ আন্তরিকতা থেকেই আমি অনুমান করি যে, কর্নেল রঞ্জিত তার বহু পুরাতন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। কর্নেল শংকর তার প্রিয় বন্ধু কর্নেল রঞ্জিতের উপর গোলা বর্ষণ অব্যাহত রেখে বলেন, রঞ্জিত! আমার মনে হয় তোমার সর্বনিম্ন শাস্তি চাকরিচ্যুতি হবে। সেনা সদস্য হওয়ার কারণে অন্যকোন কাজ তো জান না। যদি তুমি বল তবে আমি ওয়ানুদকে তার চায়ের ব্যবসায় তোমাকে শরীক করার জন্য সুপারিশ করবো। কর্নেল রঞ্জিত নীরবে নত শিরে কর্নেল শংকরের সকল আক্রমণ মুখ বুজে সয়ে যায়। ক্ষাণিক পর কর্নেল শংকর নীরবতা ভেঙ্গে বললো, পাকিস্তানী মেজর আহসান ও তার সাথীদের বন্দি হওয়া এবং তাদের মৃত্যুর পরও তারা তাদের নীতি পাল্টায়নি। কয়েকদিন পূর্বে আগ্রাতে দুইজন পাকিস্তানী গুপ্তচর বন্দি করা হয়। তার ডিভিশন কমান্ডার তাদেরকে কর্নেল রঞ্জিতের হাওয়ালা করে যে FIU-এর লোকদের মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। কর্নেল রঞ্জিত একে অযথা মাথা ঘামানো মনে করে তাদেরকে আগ্রার DMI -এর হাওয়ালা করে দেয়। DMI এবং FIU-এর মধ্যে সদা সর্বদা এক বিরোধ বিরাজমান। DMI ওয়ালারা এখানে হেড কোয়ার্টারে এবং আর্মি হেড কোয়ার্টারকে অবগত করে। আমাদের হেড কোয়ার্টারের পক্ষ থেকে আমি আগ্রা গেলাম। সেখানে DMI ওয়ালারা আমার সাথে অপমানজনক আচরণ করে। কেননা তারা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর কাছেই জবাবদিহি করে। তাই আমি সেদিনই এলাম। DMI-এর দিল্লীর

অফিসারগণ এখনও আগ্রা যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে মাত্র। এদিকে গোয়েন্দা সাথীরা শুধুমাত্র বন্দিদেরকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রহরায় নিয়োজিত ছয় সেনা সদস্যকেও হত্যা করেছে। এখন কর্নেল রঞ্জিতকে জবাবদিহি করার জন্যে এখানে ডাকা হয়েছে। তার GOCও তার সাথে এসেছে। তাকেও কর্নেল রঞ্জিতের মতই তার উদাসীনতার জবাবদিহির জন্যেই ডাকা হয়েছে। রঞ্জিত আমার বহু পুরনো বন্ধু। আমি তাকে বাঁচানোর জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার জেনারেলের সামনে কি করে তার সাফাই গাইবো?

কর্নেল রঞ্জিত ক্ষাণিক বাদেই বিদায় নিয়ে ক্লাবে এলার্টকৃত কামরায় চলে গেল। কর্নেল শংকর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাথা তুলে তারকা দেখতে থাকল। তারপর আমাকে সম্বোধন করে বললো, ওয়ানুদ! সত্যিই আমি পাক গোয়েন্দাদের মুক্তি ও ভারতীয় বাহিনীর মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছি। গোয়েন্দা যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে শত্রুদেশে প্রবেশ করে এতে তার খুব ভালো করেই জানা থাকে যে, সে সিংহের চোয়ালে মাথা রেখেছে। যার ফলে জীবিত ফিরে যাওয়ার আশা খুব কমই থাকে। গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে এবং তার সাথীদেরকে একই আবেগ নিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা তদবীর করা উচিত। কেননা বন্দি জাসুসকে কখনও মুক্ত হওয়া বা জীবিত থাকার আশা করা উচিত নয়। যতক্ষণ না সে জীবনের মায়া ত্যাগ করে জীবনবাজি রেখে নিজের মুক্তির জন্যে চেষ্টা না করবে, নির্যাতন সহ্য করে মুখ খোলার চেয়ে এবং নির্যাতন সহ্য করে তিলে তিলে জীবন নষ্ট করার চেয়ে উত্তম হলো বন্দিকারীদের দুর্বল পয়েন্ট তালাশ করা এবং এ দুর্বল পয়েন্টকে পুঁজি করে স্বার্থোদ্ধার করা। এভাবে হয়তো সে ভেগে বেঁচে যাবে, না হয় বন্দিকারীদের ঘাতক গুলিতে জীবন বিলিয়ে দিবে। বন্দির পর প্রতিনিয়ত মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। এজন্য মৃত্যুর ভয় একদম করবে না ও নিজের মুক্তির চেষ্টা কখনও পরিত্যাগ করবে না।

কর্নেল শংকর তো মদের নেশায় এ ঘটনার পিছে ভারতীয় বাহিনীর উদাসীনতার কথাই বারবার উল্লেখ করছিল। আর আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলাম। শত্রুদেশের এক কর্নেল আমাকে ভারতীয় মনে করে এ গোপন ভেদ বলে যাচ্ছিল যা ট্রেনিংকালে আমার সিনিয়র আমাকে হালকা শব্দে সংক্ষিপ্ত শব্দে বলেছিলেন। আমি তো উভয়ের কথা পরখ করছিলাম। আর ভাগ্য ভালো যে পরবর্তী বছর আমি নিজেই এ দুরবস্থার

শিকার হতে যাচ্ছিলাম। অল্পক্ষণ পর আমি কর্নেল শংকরের কাছে বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। আমি ক্লাট সারকাস থেকে তার জন্যে গরম সলটেস নিয়ে গিয়েছিলাম। এজন্যে কর্নেল আমার শুকরিয়া আদায় করে। তারপর আমি হোটেলের পথ ধরলাম।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার যশোবন্তের শুভদিন থাকায় এ শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্যে বারবার দাওয়াত ও জোর তাকিদ দিল। কিন্তু আমি উজর পেশ করলাম এবং এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করলাম যে, এ অনুষ্ঠানে তুমি তোমার কয়েকজন বন্ধুকেও দাওয়াত দিয়েছ। আর তারা তোমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে খুব ভাল করেই জ্ঞাত। এখন তোমাকে যদি তারা পানির মত টাকা লুটাতে দেখে তবে সন্দেহ করতে পারে। এমতাবস্থায় তার সাথে আমাকে মাখামাখি করতে দেখে তাদের সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। যশোবন্ত আমার কথা বুঝে গেল। আমি তাকে জেনারেলের আলমারির কাগজপত্রের প্রতিদান পূর্বেই পরিশোধ করেছিলাম। বিধায় সে আমার আপত্তি মেনে নিল। আমি তাকে বললাম, তুমি দেখেছো যে তোমার সহযোগিতার প্রতিদান তোমার আশাতীতের চেয়েও বেশি এবং সঠিক সময়ে পেয়েছো। এখন সুমির কারণে অর্থের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যাবে। এত কাঠখড় পোড়ানো হাড়ভাঙ্গা মেহনতে অর্জিত আনন্দকে নিমিষেই মাটি করে দিয়ো না। সুমীর মত মেয়ে কয়েক মাসেই পুরুষকে এমন আনন্দ দিতে পারে যা অন্য নারীরা সারা জীবনেও দিতে পারে না। কেননা সুমীর লক্ষ্যবস্তু শুধুমাত্র একটিই। তা হচ্ছে প্রেমিককে আনন্দ দিয়ে তার পকেট খালি করা এবং সে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে যে কোন কৌশলকে কাজে লাগাতে সদা তৎপর।

শনিবার দিন যশোবন্ত নিয়ম মাফিক ডাক আমার সাথীদের হাতে প্রদান করেছে যা তারা তৎক্ষণাৎ কপি করে সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়ে দিয়েছে এবং এই নতুন ডাককেও কুরিয়ারের প্রদানকৃত ডাকের সাথে মিলিয়ে নেয়। কেননা আগামীকাল প্রত্যুষে স্পেশাল কুরিয়ার আসবে। আমার সাথীরা শনিবার দিন বিকালেই বাসায় এসে আমাকে জানাল যে, দিল্লী হতে বাইরে শহরে গমনকারী এবং বাইরে থেকে আগমনকারী বাসে এবং রেলওয়ে স্টেশনে ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশ এবং সেনাবাহিনী গমনকারী এবং আগমনকারী যাত্রীদের উপর কড়া নজর রাখছে। হোটেল সরাইখানা ও মুসলমান এলাকায় বিশেষ নজরদারী করা হচ্ছে। আমাদের এখানের

পুলিশের মত ভারতীয় পুলিশও উঁচুমানের হোটেলে প্রবেশের দুঃসাহস করে না। মসিবত যদি আসে তবে তা নিচু মানের হোটেলে। আমি পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সাথীদেরকে চৌকান্না থাকার জন্য এবং বিনা কারণে বাইরে যেতে নিষেধ করলাম। আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে আসলাম এবং সিনিয়রের নামে আমার পত্রের সর্বশেষ রিভাইস দিলাম।

রবিবার দিন সকালে আমার এক সাথী ডাক বহন করল, অপর এক সাথী তাকে এবং আমাকে কোর দেওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। সবজিমণ্ডি রেল স্টেশন শহরের ভিতরেই অবস্থিত। রেল লাইনের উপর দিয়ে মানুষ পারাপারের জন্যে নির্মিত রয়েছে ওভার ব্রীজ। আমি সাথীদের রেল স্টেশনের অপর প্রান্তের মার্কেটের কোন এক হোটেলে রেখে সবেমাত্র ব্রীজে উঠতে যাব এমন সময় সামনে থেকে ক্যাপ্টেন আরশাদকে দেখতে পেলাম। ক্যাপ্টেন আরশাদ পাক বাহিনীর মধ্যে জুডো ও কারাতেতে একজন দক্ষ লোক। দ্রুত দৌড়ে তার সুনাম ছিল দেশজুড়ে। আমার ট্রেনিং চলাকালে এক ফার্লং থেকে শুরু করে একাধারে এগার মাইল দৌড়ের ট্রেনিং তিনিই আমাকে দিয়েছেন। তাকে, দেখামাত্র মন চাচ্ছিল, তাকে বুকে জড়িয়ে নিতে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র চোখে চোখেই কুশল বিনিময় করলাম। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে কানে তাকে বললাম, আপনি সামনে হাঁটেন। ক্ষাণিক পরই আমি তার পিছে পিছে আসছি। তিনি ধীরগতিতে সামনে চলতে থাকলেন। আমি দ্রুতগতিতে প্লাটফর্মে আসলাম এবং বুকস্টল থেকে দুই একটি বই নিয়ে ব্রীজের দিকে ফিরে চললাম। ব্রীজের সিঁড়ি বেয়ে নামাবস্থায় আমি ক্যাপ্টেন আরশাদকে পেলাম। এখন আমরা উভয়ে এক সাথে চলতে লাগলাম। এমতাবস্থায় ক্যাপ্টেন আরশাদ আমাকে বললেন, সে তার সাথীদের পুলের ঐ প্রান্তে বাজারে রেখে এসেছে এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই অমৃতসরগামী ট্রেনে ফিরে যাবে। অমৃতসরের নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন কোন পথ সন্ধান করছে কি না। জবাবে ক্যাপ্টেন আরশাদ আমাকে জানান, অমৃতসর থেকে পাকিস্তান যাওয়ার নতুন এক পথ হাফেজ মুহাম্মদ (লাহোরের অধিবাসী পাক-ভারত সীমান্তের স্মাগলার)-এর কেরিয়ার পাণ্ড কাঞ্জরীর রাস্তা বের করেছে। ভারতের শিখ স্মাগলার তার সহযোগী এবং সে বারুদস্থান থেকে অমৃতসরের ট্রেনের যাত্রা পর্যন্ত তার হেফাজতে নিয়ে যাবে। আমাদের এদারা হাফেজ মুহাম্মদকে বিভিন্ন

ফ্যাসিলিটি/শিথিলতা প্রদান করে থাকে] এটা তার দৈনন্দিনের কাজ এবং হাফেজ মুহাম্মদ ভারতীয় স্মাগলারের লাহোর আগমন এবং যাত্রা অবদি বারুদ পর্যন্ত তার হেফাজতের যিম্মা নিয়ে থাকে। আমাদের এদারা হাফেজ মুহাম্মদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি প্রদান করে থাকে। যার বিনিময়ে তার লোকেরা আমাদের বর্ডার পারাপারের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেই নতুন রাস্তা দেখার জন্যেই ক্যাপ্টেন আরশাদ নিজে এসেছেন। তিনি আরো জানান, মণ্ডি সাদেকগঞ্জের তুলনায় এ রাস্তা অধিকতর সহজ ও কম বিপজ্জনক। কেননা বর্ডারের উভয় পাশে এক ফার্লং দূরত্বে দুটি গ্রাম রয়েছে। যে গ্রামের অধিবাসীরা এ কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং সে-ই দিল্লী পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আর ফেরতও সে-ই নিয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে আমরা এক পর্যায়ে সেই হোটেলে পৌঁছলাম, যেখানে আমার সাথীরা অপেক্ষায় ছিল। আমি আরশাদকে সেই হোটেলে নিয়ে গেলাম এবং সাথীদের নিকটবর্তী এক টেবিলে বসে গেলাম। সম্ভবত ক্যাপ্টেন আরশাদের ভারত আগমন এবারই প্রথম। আমি ইঙ্গিতে তাকে জানালাম, এরা আমার সাথী এবং আমরা সকলেই সশস্ত্র। এ কথা শুনে ক্যাপ্টেন আরশাদের পেরেশানী কিছুটা লাঘব হল। তারপর আমরা চা পান করলাম। আমি ক্যাপ্টেন আরশাদকে ডাকের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে জানালাম এবং বললাম, পাকিস্তান পৌঁছার পর মঙ্গলবার ওয়ারলেস করে জানাতে যে, নিরাপদে পৌঁছতে পারছে কি না। তাহলে আমরা ডাকের কপি নষ্ট করে ফেলব। সাথীদের ইঙ্গিত করে হোটেল থেকে উঠে পড়লাম। আমাদের পিছে পিছে দূরত্ব বজায় রেখে সাথীরা আমাদের কোর দিতে লাগল। ক্যাপ্টেন আরশাদ আনুমানিক একশত মিটার দূরে অন্য এক হোটেলের দিকে ইশারা করে বলল, তার সাথীরা সেখানে বসে আছে। সাথীদের মধ্যে এক হাবিলদারও রয়েছে তাকে কোর দেওয়ার জন্য। আমি ক্যাপ্টেন আরশাদকে সেই হোটেলে যেতে বলে সাথীদের ইশারা করলাম। ডাক বহনকারী সাথী এগিয়ে আসল এবং আমার পিছে পিছে চলতে লাগল। বাকী দুই সাথী আমাদের কোর দিচ্ছিল। এভাবে আমি এবং ডাক বহনকারী সাথী হোটেলের একদম নিকটে চলে গেলাম। আমি ডাকের প্যাকেট তার থেকে নিয়ে নিলাম এবং হোটেলের অন্দরে গিয়ে ক্যাপ্টেন আরশাদের হাওয়ালা করলাম। ক্যাপ্টেন আরশাদ তার সাথীদের মধ্য হতে

একজনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সে আগামীকাল কুরিয়ারের দায়িত্ব পালন করবে।

'সব ঠিক আছে'-এর প্রতীক হিসেবে সে সবুজ রুমাল এবং 'বিপদ সংকেত' হিসেবে সে লাল রুমাল গলায় বাঁধবে। আমিও সেই সিগন্যাল অনুসারে কোটের পকেটে সবুজ এবং লাল রুমাল রাখব। আগামীকালের কুরিয়ার এবং আমি একে অপরের অবয়ব আকৃতি খুব ভালোভাবে চিনে নিলাম। ক্ষাণিক পর আমি ক্যাপ্টেন আরশাদের কাছে বিদায় চাইলাম। তখন তিনি পাকিস্তান থেকে আগত ডাকের প্যাকেট তার সাথীদের থেকে নিয়ে আমাকে দিলেন। ডাক নিয়ে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং দুই নম্বর সাথীকে দিয়ে এক সাথীর সাথে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। আর তিন নম্বর সাথী ও আমি রেল স্টেশনে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরই ক্যাপ্টেন আরশাদ স্বীয় সাথীদের নিয়ে এসে পৌঁছলেন। তাদের এসে পৌঁছার দশ মিনিটের মধ্যেই ট্রেনও চলে আসল। তারা একে একে সকলেই দুই বগিতে উঠে বসল। ট্রেন যাত্রা শুরু করল। এমতাবস্থায় আমরা চোখে চোখেই একে অপরকে আল বিদা জানালাম। তারপর বাসায় ফিরে এলাম।

এবারের ডাকে আমাদের নতুন কুরিয়ার ছাড়াও কিছু দিকনির্দেশাসহ কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যেন নিজের সিকিউরিটির ব্যাপারে সচেতন হই। এক মাসের ভিতরেই আমাদের দুটি গ্রুপ ধরা পড়েছে। তন্মধ্য হতে এক গ্রুপ তো শহীদ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় গ্রুপ অভিনব ট্রেনিংয়ের পরও তাদের প্রথম মিশন চলাকালেই ধরা পড়ে ভারতে কাজ করার মতো যোগ্যতা হারিয়ে বেকার হয়ে গেছে। (এই নতুন গ্রুপ সম্পর্কে আমি কর্নেল শংকরের সহযোগিতায় বিস্তারিত রিপোর্টও ডাকে পাঠিয়েছিলাম।) এবারের ডাকে বাড়ির পত্রও রয়েছে। আমাদের মতো মানুষের জন্য এ পত্র অমূল্য রত্নের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ পরিস্থিতিতে বিদেশে বসে পরিবারের ভালো সংবাদ পাওয়াই বড় কথা। জেনারেলের ডাক যেহেতু আজই পাঠানো হয়েছে তাই এর উপর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। এ পর্বও ভালোভাবেই সমাধা হয়েছে। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সাথীদের বাসাতেই থাকলাম। বাসায় আনন্দের আতিশয্যে গল্প-গুজবের বান বইছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মালিক উপরে আসল এবং আমাকে বলল, আমি আপনার সাথে একাকী সাক্ষাত করতে চাই। তারপর

সে আমাকে তার সাথে নিচ তলার ডাইনিংরুমে নিয়ে গেল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই চা এবং স্ন্যাক্স এসে উপস্থিত হল।

বাড়ির মালিক আমাকে চা বানিয়ে দিলেন এবং স্ন্যাক্স সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমরা উভয়ে চুপ করে চা পান করছিলাম। আমি ভাবছিলাম, বাড়ির মালিক আমার সাথে একাকী কি বলতে চান? যখন কোন বিষয় পরিষ্কার না হয় তখন মানুষের চিন্তা-চেতনা সীমাহীন প্রান্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত করেছি, নিজে এ নীরবতাকে ভাঙ্গবো না। এদিকে বাড়ির মালিকও উপযুক্ত শব্দের তালাশে রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার কাপের চা শেষ হয়ে যায়। তখন বাড়ির মালিক অতিরিক্ত চা ঢালতে ঢালতে বললেন, আপনার সাথে একাকী কথা বলার ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার এবং আমার ভাড়াটিয়াদের মনে সংশয়ের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। কয়েক মাস যাবত এখানে আপনার যাতায়াত ও আমার ভাড়াটিয়ারা একথা বলে আমার থেকে বাড়ি ভাড়া নেয় যে, তারা বিভিন্ন শহর থেকে ব্যবসার জন্যে দিল্লী এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কখনো ঘরের বাইরে যেতে দেখিনি। আমি যদি ফ্যামেলি নিয়ে এখানে না থাকতাম তবে সময় মত ভাড়া নেয়াই আমার মূল লক্ষ্য হতো। কিন্তু একত্রে থাকতে গিয়ে তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টিও রাখতে হয়। যেহেতু আমার যুবতী মেয়ে রয়েছে তাই এক ঘরে থাকতে গিয়ে এ কাজ আমার জন্যে অপরিহার্য। সে কিছুটা নীরব হল। এ সুযোগে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাড়াটিয়ারা অসমীচিন কোন কাজ করেছে কি না? জবাবে সে বলল না। এমন কোন বিষয় হয়নি। তাদের ভদ্রতা সম্পর্কে তো আমি শপথ করে বলতে পারি, তারা তো এক পর্যায়ে আমার বাড়ির রক্ষক। একথা বলে বাড়ির মালিক আমার সে সংশয় দূর করলো। বাড়ির মালিক বলল, জনাব! মূল কথা হচ্ছে, আপনার সাথে তাদের কথাবার্তায় এবং আপনার অনুপস্থিতিতে চীফ নামে সম্বোধন করা এবং স্যার বলায় আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনারা সকলে ব্যবসায়ী নন। উপরের তলায় বসে আস্তে আস্তে বলা কথাবার্তাও আমরা নিচে শুনতে পাই। এ কথাবার্তায় আমরা যা বুঝেছি তাহলো তাদের কথাবার্তা সর্বদা কোন মিশনের প্রস্তুতি, পূর্ণতা এবং ডাক সংক্রান্ত হয়ে থাকে। দুই তিন দিন পূর্বে আমার ছোট মেয়ে গলির সামনে পড়শির বাড়িতে তার সহপাঠীর সাথে সাক্ষাত করতে

গিয়েছিল। তারা উভয়েই জানালা দিয়ে দেখছিল। এমতাবস্থায় ভাড়াটিয়ারা সামনের দরজা বন্ধ করে দিল বটে কিন্তু জানালা বন্ধ করেনি। জানালার সামনে দেয়ালে একটি বড় আয়না লাগানো রয়েছে। সেই আয়নাতে মেয়েরা দেখল, ভাড়াটিয়ারা একটি মেশিন বের করল এবং বিদ্যুতের সাথে সেই মেশিন Contact করল। এরিয়েলের একটি তার পূর্ব থেকেই জানালার বাইরে ছিল। তারা মেশিনের সাহায্যে টেলিগ্রাম পাঠানোর মতো একটি যন্ত্র ব্যবহার করল এবং কানে হেড ফোন লাগাল এবং সেই ভাড়াটিয়া কিছু লিখতেও ছিল। পনের মিনিট পর্যন্ত তারা এ মেশিন ব্যবহার করল। তারপর অন্য কোথাও রাখল এবং দরজা খুলে দিল।

বাড়ির মালিকের মুখে একথা শুনে আমার অনুভূতি শক্তি উবে গেল। আমি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মনে হল, আমার চেহারার পরিবর্তিত রঙ বাড়ির মালিক খুব ভালোভাবেই অবলোকন করেছে। আমি থুথু ফেলতে ফেলতে তাকে বললাম, আপনি একথা থেকে কি রেজাল্ট বের করেছেন? এ থেকে আপনি কী বুঝতে পেরেছেন? জবাবে বাড়ির মালিক বলল, আমার মনে হয় আপনারা অন্য কোন দেশ বা পাকিস্তানের হয়ে কাজ করছেন। আর আপনারা সকলেই পাকিস্তানী। আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর সকল আবেগ অনুভূতি সঞ্চয় করে তার চোখে চোখ রেখে বললাম, যদি আপনি নিশ্চিত হয়ে থাকেন যে আমরা পাকিস্তানী এবং পাকিস্তানের জন্য কাজ করছি তবে আপনার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। পুলিশকে খরব দিয়ে আমাদেরকে ধরিয়ে আপনি শুধুমাত্র পুরস্কারই পাবেন না বরং ভারতপ্রীতির অকাট্য প্রমাণ পেশ করতে পারেন। আমার এই শব্দমালা ডুবন্ত ব্যক্তির সর্বশেষ প্রচেষ্টার নামান্তর। বাড়ির মালিক আমার কথা শুনামাত্রই লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা... পড়ে বলল, জনাব! আপনাকে আমি চিনি না ঠিকই তবে এতটুকু খুব ভালো করেই বুঝি যে, আল্লাহ না করুন আমার যদি এই চিন্তা চেতনাই থাকতো তাহলে আপনারা আজ পুলিশের প্রহরায় থাকতেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান। পৃথিবীর সকল মুসলমান বিশেষ করে পাকিস্তানী মুসলমানদের এক কবীলাই মনে করি। আমি দিল্লীর সওদাগর ফ্যামিলির লোক। পাকিস্ত ানেও আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আপনি কিভাবে ভাবলেন যে, আমি আপনাদেরকে ধরিয়ে দিব। জনাব! আমি তো আপনার সম্পর্কে

নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে, বাস্তবেই আপনি একজন পাকিস্তানী এবং পাকিস্তানের জন্যে কাজ করছেন। আমি আপনাকে দিল্লীর ঐ সকল মানুষদের সম্পর্কে বলতে ও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাতে চাচ্ছি যাদের তৎপরতা ভারতবিরোধী এবং তারা এমন কোন মুহূর্তকে ছাড়ে না যার দ্বারা হিন্দুস্থানের ক্ষতি সাধন করা যায়।

আমার জন্যে বাড়ির মালিকের একথা অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত ছিল, আমি তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কয়েক মিনিট নীরবে তন্ময় হয়ে তাকে দেখতে থাকলাম। এ সময় তার সম্পর্কে শত কোটি ইতিবাচক, নেতিবাচক চিন্তা আমার মন-মগজে উদিত হয়েছে। সে আমাদের মূল পরিচয় ও ট্রান্সমিটার সম্পর্কে জেনে গেছে। এমন অবস্থার সম্মুখীনকালে আমাদের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তাকে শেষ করে দেওয়া চাই। এর সাথে সাথেই আমার যশোবন্তের কথা মনে পড়লো। সে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে এবং জীবনের ভয়ে আমাদের সাথে ভরপুর সহযোগিতা করে যাচ্ছে। যেমন নাকি আমি এখনই বাড়ির মালিককে বলেছিলাম যে, আমাদের সম্পর্কে এত কিছু জানার পর তো তার পুলিশে খবর দেয়ার কথা ছিল। সে প্রথমে এমন আচরণ না করা এবং আমাকে পাকিস্তানের সহযোগীদের সাথে পরিচয় করানোর কথা বলা তার কোন চালবাজি, কৌশল নয় তো? নীরবতার এই অল্প সময়ে আমি অনেক কিছু ভাবলাম। পরিশেষে মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে একটি ফায়সালা করলাম। আমি বাড়ির মালিককে সম্বোধন করে ধীরকণ্ঠে বললাম, বর্তমানে এই মুহূর্তে আমি আপনাকে আমার এবং আমার সাথীদের ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকুই বলতে পারি যে, আপনি যা কিছু ভেবেছেন তা সবই সত্য। আমরা আমাদের জীবন হাতে রেখে এ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কাজে বাধাদানকারী যে কাউকে অনতিবিলম্বে শেষ করে দেয়া আমাদের জন্য কোন ব্যাপারই না। কিন্তু মাতৃভূমির সহযোগীদের জন্য আমরা জীবনবাজি রেখে লড়াই করতেও প্রস্তুত। আপনি আমাদের আসল পরিচয় জানা সত্ত্বেও যে উত্তম ব্যবহারের উপমা পেশ করেছেন, এজন্যে আপনার এখলাসের উপর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনি যে সকল দেশীয় সহযোগীদের আলোচনা করেছেন হতে পারে তাদের মাঝেও কোন কালো কুশ্রী বাঘ লুকিয়ে আছে। আমাদের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের

মিশন, বিধায় আপনি এই মুহূর্তে তাদেরকে আমাদের মূল পরিচিতি সম্পর্কে কিছু বলবেন না। আমাদেরকে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করান। আমরা আমাদের পদ্ধতিতে তাদের যাচাই বাছাই করবো। আপনি তাদের শুধু এতটুকুই বলবেন যে, আমরা তাদের মতই একই চিন্তা-চেতনার ভারতীয় মুসলমান। তাদের এটাও বলবেন না যে আমার সাথীরা আপনার ভাড়াটিয়া। আমি যাবার জন্যে উঠলাম। তখন বাড়ির মালিক এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে নিল। এহেন মুহূর্তে তার চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরছিল। তখন সে বলতে লাগলো, পাকিস্তানই ভারতীয় মুসলমানদের শেষ ভরসা।

পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ও বিদ্রোহের কারণে ভারত যা কিছু করেছে তাতে ভারতীয় মুসলমানদের চক্ষু খুলে গেছে এবং চাটুকারদের আসল চেহারা জনতার সামনে দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠেছে যে, নিজ ধর্মের উঁচু নিচু ভেদাভেদ বিশ্বাসী উগ্র হিন্দুরা সুবোধ শান্ত মুসলমানদের কি করে মেনে নিতে পারে। এই উগ্র হিন্দুরা আমাদের তো ম্লেচ্ছ বলে। অর্থাৎ তাদেরই ধর্মের অনুসারী সর্বনিকৃষ্ট জাতি শূদ্র'র চেয়েও আমাদের নিকৃষ্ট মনে করে। যে শূদ্রদের ছায়া পড়াতে তারা ভ্রষ্ট (নাপাক) হয়ে যায়। ভারতে সেক্যুলারিজমের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার পুল বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সুবাদে খুলে গেছে যে, মিথ্যা প্রোপাগান্ডার শিকার একমাত্র ভারতীয় মুসলমান তারাও আজ এ চরমপন্থীদের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কতিপয় মুসলিম নামধারী গাদ্দার যাদের ভারত সরকার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে ক্রয় করে রেখেছে, তাদের ছাড়া সমগ্র ভারতে মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। আর আপনিই এই দুই নয়নে দেখতে পাবেন যে যখনই সময় আসবে সুযোগ হবে তখন ভারতীয় মুসলমান সে একই ভূমিকা পালন করবে, যে ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীরা করেছে। আমি আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই একই মন মানসিকতার সাথীদের বাছাই করে এক স্থানে একত্রিত করে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করাব এবং মিটিংয়ের দিন তারিখ ও সময় স্থান আপনার সাথীদের জানিয়ে দিব।

বাড়ির মালিকের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি সরাসরি সাথীদের কাছে চলে গেলাম এবং তাদেরকে এ আলোচনা সম্পর্কে অবহিত করলাম। তারাও আমার সিদ্ধান্তে সম্মতি জানাল। আর আমি এ সাক্ষাতের আলোকে নিজের এক নতুন মিশনের চিত্র অংকন করতে করতে হোটেলে

চলে আসলাম। বুধবার দিন আমরা ট্রান্সমিটারযোগে ক্যাপ্টেন আরশাদ ডাকসহ নিরাপদে পাকিস্তান পৌঁছার সুসংবাদ পেলাম। তার সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দেওয়া হলো যে আগামী রবিবার ক্যাপ্টেন আরশাদের সাথে সাক্ষাতস্থলেই নতুন কুরিয়ারের সাথে সাক্ষাত করতে হবে। কেননা ক্যাপ্টেন আরশাদ-এর সাথে সাক্ষাতকালে নতুন কুরিয়ারের সাথে সাক্ষাতের স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। আমি সাথীদের সাথে মিলে আজ পর্যন্ত প্রেরণকৃত সকল ডাকের কপি আগুনে জ্বালিয়ে ফেললাম। মঙ্গলবার যশোবন্তের তরফ থেকে নতুন ডাক পেলাম। সাথে একটি পত্র যাতে আমাকে বুধবার বিকালে সাক্ষাত করতে বলা হয়েছে। আমি চাউড়ী বাজারের রেস্টুরেন্টে যেতে যেতে বিরক্ত হয়ে গেছি। কিন্তু এছাড়া আর উপায় কি? এর চেয়ে নিরাপদ স্থান যে আর কোথাও নেই। গুলচা সিনামার রেস্টুরেন্টও পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী গ্রেফতার হওয়ার পর তা আর নিরাপদ স্থান বাকী থাকেনি। যার ফলে ভারতীয় সিকিউরিটি ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র হয়েছে এবং আইবি ও ডিএমআই-এর কুকুরগুলো সর্বত্র গন্ধ খুঁজে ফিরছে। এশুনাতে সাক্ষাতে নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা ছাড়াও আমার কাছে অতিরিক্ত টাকা চেয়েছে। সুমীর দাবী পূরা করার জন্যে তার টাকার প্রয়োজন। যশোবন্ত প্রদানকৃত প্রতি পয়সার পাই পাই করে যথাযথ হিসাব আমি রেখেছি। আমি তাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে বললাম, আজ পর্যন্ত সকল কাজের বিনিময় তোমাকে প্রদান করা হয়েছে। এখন তোমাকে শুধু আগামী সপ্তাহের নতুন ডাকের প্রতিদান প্রদান করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি উল্লেখযোগ্য বড় কোন কাজ সম্পাদন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু পাবে না। আমি খুব ভালো করেই জানতাম যশোবন্ত যে কাদা মাটিতে পা দিয়েছে সেখানে শুধু রক্তচুষা জোঁক ছাড়া অন্য কিছু নেই। তাই সুমীর দাবী পূরা করতে গিয়ে তাকে জীবনবাজি রাখতে হবে।

শুক্রবার দিন আনুমানিক রাত দুটোর দিকে টেলিফোন সেটটি অনবরত ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে চলল। ফলে আমি ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে বসলাম। এটা ছিল আমার দুই নম্বর সাথীর টেলিফোন। ফোনে সে আমাকে জানাল, বাড়ির মালিক নাজির শেরওয়ানী এই মুহূর্তে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছে। আর এ ফোনও সে তারই বাসা থেকে করছে। নাজির শেরওয়ানী তাকে বলেছে, এই মুহূর্তে তার আমার সাথে সাক্ষাত করা একান্ত দরকার। আর সাক্ষাত করার এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ

সময়। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এত রাতে তার এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতে পারে। যার জন্য এই মুহূর্তে নাজির আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছে। আমি দুই নম্বর সাথীকে বললাম, সরাসরি নাজিরের সাথে আমাকে কথা বলাতে। জবাবে দুই নম্বর সাথী আমাকে জানাল, নাজির ড্রয়িংরুমে নতুন অতিথির সাথে বসে আছে। আর সে এ ফোন নাজিরের বেডরুম থেকে করছে। তাই তাকে এখনই ডেকে দিচ্ছে। এক মিনিট অতিবাহিত হতে না হতেই অপর প্রান্ত থেকে নাজিরের কণ্ঠ শোনতে পেলাম। ফোনে সে আমাকে জানাল, সে আমাকে কারও সাথে এখনই সাক্ষাত করাতে চাচ্ছে যে তার সাথে করে আমার জন্য মূল্যবান তোহফা এনেছে। এ সকল কথা এমনভাবে হয়েছে যে, আমি তখনই বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। দ্রুতগতিতে কাপড় পরিবর্তন করে সাইলেন্সার যুক্ত পিস্তল সাথে নিয়ে হোটেলের লবিতে চলে আসলাম। এ সময় পথে ট্যাক্সি পাওয়া কল্পনাতীত। তাই শিফট ম্যানেজার আমাকে বলল, সে এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রীদের আনা নেওয়া করার জন্যে যে গাড়ি রয়েছে সে গাড়ি আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। যার ভাড়া ট্যাক্সির ভাড়ার চেয়ে দশগুণ বেশি হবে। এছাড়া আর দুসরা কোন উপায় আমার কাছে ছিল না। তাই অগত্যা নিরূপায় হয়ে সে গাড়িতে করেই সাথীদের বাসার অদূরে পৌঁছে গাড়ি বিদায় করে দিলাম। গলিপথে সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে। শুধু আমার দুই সাথী গলিপথে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বাসায় পৌঁছার পূর্বে তাদের কাছে এ মুহূর্তে ডাকার কারণ জানতে চাইলাম। কিন্তু তারা কোন সদুত্তর দিতে পারল না। দুই নম্বর সাথী এদেরকে আমার কোর দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে। তারা শুধু এটুকুই জানে। তাছাড়া তারাও চিন্তিত ছিল যে, এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যার জন্যে আমাকে এ গভীর রাতে ডাকা হয়েছে।

আমি নাজিরের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলাম এবং নতুন অতিথিকে দেখামাত্রই আমার চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। আর একই অবস্থা অতিথিরও। ইতোপূর্বে আমি উভয় সাথীকে সিঁড়ি কোঠায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং চৌকস থাকতে বলেছি। দুই নম্বর সাথীকে ইশারা করা মাত্রই সে উপরে চলে গেল। এখন ড্রয়িংরুমে শুধুমাত্র আমি, নাজির ও নতুন অতিথি। নতুন অতিথি এবং আমি একে অপরকে অপলক নেত্রে দেখছিলাম। নাজির আমাদের অবস্থা দেখে খেই হারাল। এহেন মুহূর্তে

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি পিস্তল থেকে বের করে হাতে নিয়ে নিলাম। ব্যাপারটি এমন ছিল যে নতুন অতিথি কর্নেল শংকরের বেটম্যান আব্দুল করীম। যে আমাকে কর্নেল শংকরের বন্ধু হিসেবে অনুদ চোপড়া নামে চিনতো। আর সে আবদুল করিমকে আমি এই মুহূর্তে নাজির শেরওয়ানীর ঘরে দেখে পেরেশান হচ্ছিলাম। আমার হাতে পিস্তল দেখে তারা উভয়েই ভড়কে গেল এবং তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমি বড় কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছি। আমি যে কোন মূল্যে নিজে এবং সাথীদের এ হীন ষড়যন্ত্রের জাল থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছিলাম। পরিশেষে আমি এ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হই যে উভয়কে শেষ করে আমাদের এখান থেকে বের হতে বেশির চেয়ে বেশি পনের মিনিট লাগবে মাত্র। এমনই মুহূর্তে নীরবতা ভঙ্গ করে আব্দুল করিম মুখফুটে বলে ফেলল, উনুদ সাহেব আমার কি অপরাধ?

আব্দুল করিমের মুখে উনুদ নাম শুনে নাজির আরও বেশি ভড়কে গেল। এখন সে ভাবতে লাগল, সে কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছে। আমাদের তিনজনেরই অবস্থা এমন হয়েছে যা লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। আমি পিস্তলের নল নাজিরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মতলব কি? অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাজির জবাবে মুখ খুলে বলতে লাগল, উনুদ সাহেব! আমার কচি কচি সন্তান আছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। এমতাবস্থায় আব্দুল করিম হাত করজোড় করে কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল, হুজুর! আমাকে মাফ করে দিন। আমার থেকে বড় ভুল হয়ে গেছে। আমার কিছুই বুঝে আসছে না যে এসব কি হতে যাচ্ছে। আমি আব্দুল করিমের এ উক্তি শুনে পিস্তলের নল আব্দুল করিমের দিকে তাক করে বললাম, জবাব দাও এবং তড়িঘড়ি উত্তর দাও, ব্যাপার কি?

আমার হুংকার শোনে আব্দুল করিমের মুখ থেকে রা বের হচ্ছে না। তদুপরি খুব কষ্ট করে বলল, নাজির আমাকে বলেছে পাকিস্তানী একজন অফিসারের সাথে আমাকে সাক্ষাত করাবে। আমি পিস্তলের নল নাজিরের দিকে ঘুরিয়ে পিস্তল পিঠে ঠেকিয়ে দিলাম যেন সে মুখ খোলে। এরপরও যখন সে মুখ খুলল না তখন আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম, যদি তোমরা উভয়ে আমাকে সমস্ত কথা খুলে না বল তবে তোমাদের উভয়কেই কাল বিলম্ব না করে শ্যুট করব। আমি পিস্তলে লাগানো সাইলেন্সারের দিকে ইংগিত করে বললাম, গুলির আওয়াজও বের হবে না। বিনা

আওয়াজে নীরবেই ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যাবে। আমার ধমকিতে তারা কাবু হয়ে গেল এবং নাজির মুখ খোলে বলতে শুরু করলো–

স্যার! আমি তো জানিই না যে আপনি মুসলমান না হিন্দু। পাকিস্তানী না ভারতী। আমি শুধুমাত্র আপনার সাথে যে আলোচনা করেছি সে ভিত্তিতে আমাদের একান্ত সাথী আব্দুল করিমকে আপনার সাথে দেখা করানোর জন্যে এখানে ডেকেছি। এমতাবস্থায় আব্দুল করিম তার কথা কর্তন করে বলল, ইনি হচ্ছেন অনুদ সাহেব! আমার কর্নেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমার কর্নেলের সাথে দেখা করার জন্যে বহুবার সার্ভিস ক্লাবে গেছেন এবং আমিও তার সাথে দেখা করার জন্যে কয়েকবার লুধি হোটেলে গেছি। শেরওয়ানী সাহেব! আপনি আমাকে একদম মেরে ফেলেছেন। আপনার কথায় এখানে এসে আমি এমন ভুল করলাম যে, এখন আমার বাঁচার আর কোন আশাই বাকি থাকল না। এই বলে সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করলো। এদিকে আমি ভাবতে লাগলাম যে, কোথাও না কোথাও ভুল অবশ্যই হয়েছে। যার কারণে এসব হচ্ছে। তখনই আমার স্মৃতিপটে ফুটে উঠল এক আলোর রশ্মি। সাথে সাথেই আমি নির্ণয় করতে সক্ষম হলাম যে, এসবের মূলে হচ্ছে অনুদ শব্দ। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করে তাদের উভয়কে বললাম, সত্যকথা হচ্ছে, আমি একজন মুসলমান ও পাকিস্তানী। তবে ভারতে অনুদ নাম ধারণ করে আছি। আমার এ কথার সত্যায়ন আমার সাথীও করতে পারবে। আমার এ কথায় তাদের ভীতি কিছুটা কমে গেল ঠিক, তবে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস তখনই করল যখন পিস্তল ঘুরিয়ে হোলস্টারে রাখলাম।

আব্দুল করিম তখন নির্ভয়ে বলতে শুরু করলো, স্যার! তিন চার দিন পূর্বে নাজির সাহেব আমার সাথে আপনার কথা আলোচনা করেছে। যে আলোচনায় আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি। তাছাড়া আমি এ সুযোগেরই সন্ধানে ছিলাম। যেই কামনা সেই কাজ। আজ কর্নেল শংকরের কাছে DMI -এর একজন ব্রিগেডিয়ার আসলেন এবং ব্রিগেডিয়ার তার ব্রিফকেস থেকে একটি ডায়েরি বের করে কর্নেল শংকরকে দেখাল। আমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে তাদের এ কথাবার্তা শুনছি। সে কর্নেল শংকরকে বলল যে, এ ডায়েরিতে ঐ সকল ভারতী মুসলমানদের contact -এর বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে যারা দেশ ভাগের পর পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছে এবং ভারতের কল্যাণে জীবনবাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া DMI -এর

কামনাও এটা। কর্নেল শংকর ডায়েরি দেখার পর ব্রিগেডিয়ারকে ফেরত দিতে গিয়ে বললেন, আমি জেনারেলের সাথে কথা বলে তোমার সাথে সিটিংয়ের ব্যবস্থা করব যাতে করে হেড কোয়ার্টারের পক্ষ হতে তোমার ফান্ড বৃদ্ধি হয়। জেনারেল যদিও তোমার প্রতি এ কারণে অসন্তুষ্ট যে, তুমি তোমার কাজের রিপোর্ট তার কাছে পেশ কর না এবং সেনা বাহিনীতে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আমাদের চেয়ে উত্তম মনে কর। তথাপি তোমার সাথে সাক্ষাত ও ডায়েরি দেখার পর অবশ্যই সে তার সহযোগিতার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করবে। ব্রিগেডিয়ার ডায়েরি ব্রিফকেসে ভরে ব্রিফকেস আমার হাতে দিয়ে কর্নেল শংকরের কামরায় তা হিফাজত করতে বলল। তার পরই সে মদ পান করে মাতাল হয়ে গেল। আমি এ মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্যে হেফাজত থেকে সেই ব্রিফকেসই উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। কেননা এ নম্বর দিয়ে লক করা ব্রিফকেস খোলা আমার পক্ষে সম্ভব না। এখন আমার ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা তার চিন্তাও করা যাবে না। এখন আমি আন্ডারগ্রাউন্ডের কর্মীদের সাথে থেকে নিজেকে লুকাতে চাই। তাছাড়া এখন আমার তালাশে চারদিকে হাজার হাজার সৈন্য বেরিয়ে পড়েছে। যার কারণে আমার ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা তার কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাই আমি এখন এখানে আন্ডার গ্রাউন্ডে কর্মরত সাথীদের সাথে থেকে নিজেকে লুকাতে চাই। শুধুমাত্র আপনিই পারবেন ভারতীয় বাহিনীর হাত থেকে কিভাবে বেঁচে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করতে। আমার যা করার ছিল তা আমি করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব।

আমি (অনুদ সাহেব) তাকে ব্রিফকেস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তা কোথায়? তখন সে সোফার পিছন থেকে ব্রিফকেস উঠিয়ে এনে আমার সামনে রাখল। নম্বর দিয়ে লক করা ব্রিফকেস খোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় আমি দুই নম্বর সাথীকে ডাকলাম। সে তার ট্রান্সমিটার ঠিক করার যন্ত্রপাতি দ্বারা কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্রিফকেসের ভিতরের তালা ভেঙ্গে খুলে ফেলল। দেখলাম, তাতে টপ সিক্রেট লিখিত চার পাঁচটি ফাইল ও একটি ডায়েরি রয়েছে। আমি ডায়েরি খুললাম এবং দেখলাম, ডায়েরিতে আব্দুল করিমের কথা অনুযায়ী পাকিস্তানে ভারতের স্বার্থে জীবনবাজি রেখে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজে নিয়োজিত মুসলমানদের নাম, ঠিকানা ও কন্ট্রাক্ট নম্বর লেখা রয়েছে। আমি যতই নাম পড়ছি আমার পেরেশানী ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অবাক হচ্ছি। তাছাড়া এ

ডায়েরিতে এমন কিছু নামী দামী রাজনীতিবিদ ও রাজকর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যবসায়ীদের নাম রয়েছে যাদের ব্যাপারে পাকিস্তানের কোন মানুষ এ কল্পনাও করতে পারবে না যে, পাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্রের এ সকল গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাবৃত্তি করবে এবং তার বিনিময়ে অর্থের পাহাড় জমাবে।

এই ডায়েরিতে লিখিত নামসমূহ পাঠ করার দ্বারা আমার মনে হচ্ছিল যে, সমগ্র পাকিস্তানে ভারত তার গোয়েন্দা বাহিনীকে এমন সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়েছে যে, এমন কোন অফিস বা শাখা নেই যেখানে তাদের গুপ্তচর ফিট করেনি। পেশোয়ার হতে করাচী পর্যন্ত প্রত্যেক শহর ও সেনা ছাউনীতে তাদের কর্মী বাহিনী রয়েছে। আর তাদের কর্মী বাহিনীতে ঐ সকল শিল্পপতিগণও রয়েছে যারা পাকিস্তান সরকারের সাথে যোগসাজস করে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মিল-ফ্যাক্টরি খুলেছে এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও অথরিটির প্রশংসায় সমগ্র পাকিস্তান পঞ্চমুখ। তাছাড়া এ ডায়েরিতে ঐ সকল প্রবীণ রাজনীতিবিদদের নামও লেখা আছে, যাদের কেবলা হচ্ছে দিল্লী ও গডফাদার হচ্ছে গান্ধী। এ সকল রাজনীতিবিদ বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাদের বক্তব্যে বলেন, পাকিস্তানের মুহাব্বতে প্রয়োজনে নিজের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিতে প্রস্তুত। দেশ বিভাগের পর এই শিশুতুল্য পাকিস্তানে Planted মুসলমানদের সাথে মুসলিম বেশে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিন্দু গোয়েন্দারাও অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আমি তো চিন্তা ও পেরেশানীতে খেই হারাচ্ছিলাম যে, এমন সুশৃঙ্খল ও সুবিশাল নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান আজও ভারতের হাত থেকে কিভাবে বেঁচে আছে। বাঁচার তো কোন পথ নজরে পড়ছে না। এটা একমাত্র আল্লাহর বিশেষ রহমত বিনে আর কিছু নয়।

ব্রিফকেসের অন্যান্য কাগজপত্র তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি দুই নম্বর সাথীকে ডায়েরির প্রতি পৃষ্ঠা দুই কপি করে ফটো কপি করে আনতে বললাম। এখন ঘরে শুধুমাত্র বাড়ির মালিক, আব্দুল করিম আর আমি রইলাম। করিডোরে ডিউটিরত সাথীকেও আরাম করতে বললাম। এই ডায়েরি আমার সিনিয়রের জন্যে একটি অপ্রত্যাশিত নিয়ামত। যার কল্পনাও সে করতে পারতো না যে, এমন তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ ডায়েরি কোনদিন আমাদের হাতে আসবে। তাই আমি এ অপ্রত্যাশিত আশাতীত আনন্দের মাঝেই আমাদের পরস্পর ভুল বুঝাবুঝির অবসান করতে

চাইলাম এবং আমি দাঁড়িয়ে প্রথমে আব্দুল করিম তারপর নাজির শেরওয়ানী (বাড়ির মালিক)-এর সাথে মুআনাকা করলাম এবং তাদেরকে বিস্তারিতভাবে বললাম যে, আমি এ কামরায় যা কিছু করেছি সবই নিজ মিশনের সিকিউরিটির জন্যে করেছি। এখন আমাদের মাঝ থেকে যখন সকল ভুল বুঝাবুঝির যবনিকাপাত হয়েছে তখন আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে ভবিষ্যত কর্মসূচী নিয়ে ভাবতে হবে। আমার এ কথায় আব্দুল করিম ও নাজির উভয়েই শান্ত হল এবং তাদের চেহারায় প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠল। এ কথাবার্তার মাঝে কখন যে রাত ফুরিয়েছে তা আমরা টেরই পাইনি। ভোরের পাখি যখন রাতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে কলরবে মেতে উঠল ঠিক তখনই নাজিরের ঘর থেকে গরম চা, ডিম পরোটার নাস্তা এলো। আমরা সকলে একত্রে নাস্তা করছি আর আলোচনা করছি, এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আব্দুল করিমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, শুধুমাত্র দিল্লী নয় বরং সারা ভারতেই তার অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতের কোন স্থানই তার জন্যে বিপদমুক্ত নয়। আর সে গ্রেফতার হলে আমাদের মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। আমি তাকে বললাম, কমপক্ষে এক সপ্তাহ আব্দুল আমার সাথীদের সাথে থাকবে এবং এক মুহূর্তের জন্যেও বাইরে বের হবে না। যখন দিল্লীতে তার সন্ধান তৎপরতায় ভাটা পড়বে এবং পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসবে তখন তাকে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী এলাকাতে অবস্থানরত আমাদের সহকর্মীদের নিকট পাঠিয়ে দিব।

তাছাড়া আমি ডায়েরি পাকিস্তান পাঠিয়ে আমার সিনিয়রের কাছে করজোড় নিবেদন করব যে, তিনি যেন তাকে পাকিস্তানে নিয়ে নেন। তার এ খেদমতের বিনিময়ে তাকে যেন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দিয়ে দেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার আবেদন প্রত্যখ্যান করা হবে না। তাছাড়া আব্দুল করিমও পাকিস্তান যেতে আগ্রহী। ভারতে আপনজন বলতে তার কেউ নেই। সেনা বাহিনীতে তার সাথে যে অপমানজনক আচরণ করা হয়েছে এর ফলে সে ভারত তথা সেনা বাহিনীর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে গেছে। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে DMI-এর ব্রিগেডিয়ারের গোপন তথ্যে পূর্ণ ব্রিফকেস নিয়ে পলায়ন করা। ধরা পড়লে যার শাস্তি হবে নিশ্চিত মৃত্যু। আমি আব্দুল করিমকে সাথে নিয়ে উপর তলায় সাথীদের কাছে গেলাম। তাদের সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে বললাম, আব্দুল করিম এখন

থেকে তাদের সাথে থাকবে। যেন কোনভাবেই কামরার বাইরে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবে। তারপর সাথীদের পৃথকভাবে বললাম, নিঃসন্দেহে আব্দুল করিম বিরাট কাজ করেছে। আমি তাকে নিরাপদে পাকিস্তান পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তদুপরি তারা যেন আব্দুল করিম থেকে সর্বদা সতর্ক থাকে। যদিও সে বিনা লোভে ও স্বার্থে এমন বিপজ্জনক কাজ করেছে তার পিছনে ইন্ধন যুগিয়েছে তার ভারত বিরোধী আপোসহীন মানসিকতা। ভারতীয় অফিসারদের অশ্লীল গাল-মন্দ তাকে ভারত বিরোধিতায় উস্কে দিয়েছে ও প্ররোচিত করেছে। যার কারণে সে সেই দুঃখে ও ক্ষোভে এখানেও এমন কোন কাজ করে বসতে পারে, যা আমাদের সকলকে মসিবতে ফেলে দিতে পারে। তাই আমি সাথীদের বললাম, তারা যেন এমন সুযোগই না দেয় যাতে সে এমন অঘটন ঘটাতে পারে। যদি এত সতর্কতা অবলম্বনের পরও এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে যেন সেখানেই খঞ্জর দিয়ে হত্যা করে ফেলা হয়। যেভাবে আমরা আমাদের জীবনের চেয়ে আমাদের মিশনকে অধিক প্রিয় মনে করি ঠিক তেমনিভাবে আমাদের সেই প্রিয় মিশনের সংরক্ষণের জন্যে কারও জীবন হত্যা করতে দ্বিধা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যদিও সেই ব্যক্তি আব্দুল করিমই হোক না কেন। তখন আমার সাথীরা বলল, সর্বদা দুইজন সাথী কামরায় উপস্থিত থাকবো এবং সিঁড়ি কোঠার উপরের দরজা বন্ধ রাখবো। তারা এও বলল যে, আব্দুল করিমকে আন্ডারগ্রাউন্ডে সহযোগীদের নিকট পাঠানো উচিত হবে না। একে তো তাদের কাছে কোন মিশন নেই, তাছাড়া তারা আব্দুল করিমকে যথাযথভাবে হেফাজত করতে পারবে না। আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র আব্দুল করিমকে গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচানো নয়; বরং তাকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায়ও রাখতে হবে। এ সকল কাজের দায়িত্ব আমার সাথীরা গ্রহণ করল।

আমি কথার সাথে একমত পোষণ করে অধিক দিকনির্দেশনা দিয়ে পুনরায় বাড়ির মালিকের কাছে চলে এলাম এবং তাকে বললাম, পরিস্থিতি এমন অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে যে, এ মুহূর্তে আপনাকেও পরিপূর্ণভাবে চোখ কান খোলা রেখে সতর্ক থাকতে হবে। কমপক্ষে পনের দিন সাথীদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকবেন ও বাসা থেকে কম বের হতে চেষ্টা করবেন। সুকৌশলে আপনার প্রতিবেশীকে বলবেন, তোমার মেয়ের বান্ধবী চৌবাচ্চার উপর যা কিছু দেখেছে তা যেন কারও

সাথে আলোচনা না করে। এবার বাড়ির মালিক বললেন, আমার প্রতিবেশী তো সে নিজেই আন্ডারগ্রাউন্ডে সহযোগীদের এক রকম উপদেষ্টা। তার ঘর থেকে কখনও গোপন তথ্য বাইরে পাচার হবে না। এরপর আমি নাজির সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমার হোটেলে চলে এলাম। সারাটি রাত জেগেই কাটালাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন আমার চোখ খুলল তখন গোধূলী বেলা। দিনের বিদায় ও রাতের আগমনী বার্তা জানিয়ে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে।

পরদিন আমি শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চাইলাম। বিনা কারণে অনর্থক ট্যাক্সি করে শহর প্রদক্ষিণ করা নিরাপদ নয়। তাই আমি আশুকা হোটেলে চলে গেলাম এবং সেখান থেকে ট্যুরিস্ট বাসে নতুন দিল্লী ও পুরাতন দিল্লীর দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণও করলাম এবং শহরের পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করলাম। দেখলাম, সর্বত্র কিছু লোক দৌড়াদৌড়ি করছে। বিশেষ করে লোকালয় এবং মুসলমান এলাকায় মোড়ে মোড়ে চেকিং চলছে। কারুলবাগ ও খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ তো পুলিশ চারদিক থেকে বেষ্টনী দিয়েই রেখেছে। তাছাড়া লাল কিল্লা, কুতুব মিনার ও হুমায়ুনের কবরস্থানেও সিভিল পোশাকে সেনা সদস্য ও পুলিশ গমনাগমনকারীদের চেক করছে। সম্ভবত তাদের আব্দুল করিমের চেহারা ও অবয়ব আকৃতি সম্পর্কে ব্রিফিং করা হয়েছে। আমি লক্ষ্য করলাম, আব্দুল করিমের চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দিল্লীর এ থমথমে পরিস্থিতি কমপক্ষে পনের দিন অব্যাহত থাকবে।

এদিকে বিশ্বনাথ থেকে আমরা নিয়মিতভাবে সংবাদ পাচ্ছিলাম। বুধবারের দিন পাকিস্তানে যোগাযোগ করার পর জেক পাট পাওয়ার সংবাদ ও বিশ্ব কেরিয়ার পাঠানোর সংক্ষিপ্ত বার্তা পেলাম। পরবর্তী রবিবারে ওয়ারল্যাস মারফত সংবাদ পেলাম যে, গতবারে ডাক গ্রহণকারী কুরিয়ারই বুধবার সেই নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করবে। এবারের বুধবারেও ক্যাপ্টেন আরশাদ পূর্বের ন্যায় আসলেন। আমি ডাক এবং ডায়েরি তার হাতে হস্তান্ত র করলাম। আমি আব্দুল করিমের অবস্থাও বিস্তারিতভাবে লিখলাম এবং তাকে পাকিস্তানে নেয়ার জন্যে আবেদন করলাম। দরখাস্তে এটাও লিখেছি যে, আব্দুল করিম যতদিন আমাদের নিরাপত্তায় থাকবে ততদিন আমাদের মিশন এবং আমরা বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকব। তাছাড়া তার

নিরাপত্তায় সমস্ত সময় ব্যয় করার কারণে আমার সাথীরা অন্য মিশনে সময় দিতে পারছে না। অতএব তাকে তড়িঘড়ি পাকিস্তান নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। অন্যথায় পাকিস্তানের স্বার্থে জীবনবাজি রেখে আকাশ-কুসুম কর্ম সম্পাদনকারীর জীবনের নিরাপত্তা ও পুরস্কার প্রদানের পরিবর্তে আমরা তাকে হত্যা করতে বাধ্য হবো।

আমার এ মর্মস্পর্শী লেখা আমার সিনিয়রের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হল। যার ফলশ্রুতিতে আব্দুল করিম আমাদের কাছে মেহমান থাকার আঠার দিন পর কুরিয়ার তাকে সাথে করে পাকিস্তান নিয়ে গেল। আব্দুল করিমকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব প্রদান করা হল এবং ব্যবসা করার জন্যে পুরস্কারস্বরূপ ষাট হাজার টাকাও দেয়া হল। তারপর আব্দুল করিম পাকিস্তানে বিবাহ করল এবং আলহামদুলিল্লাহ আজো সে ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করছে। আব্দুল করিম যতদিন মেহমান হিসেবে আমাদের কাছে ছিলো ততদিন আমাদের জান কণ্ঠনালীতে আটকে থাকলো। ঠিক একই অবস্থা নাজির শেরওয়ানীর। ভারতীয় পুলিশ এবং আর্মি সম্মিলিতভাবে দিল্লী থেকে বের হওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কোন গমনা-গমনকারীর পক্ষে সম্ভব নয় তাদের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এমন করুণ পরিস্থিতিতে যখন দুইজন ক্যারিয়ার আব্দুল করিমকে নিতে আসলো তখন আমার সাথীরা নিজেদের কাছে রক্ষিত কৃত্রিম গোফ, দাড়ি এবং শিখদের পাগড়ি পরিয়ে আব্দুল করিমকে পরিপূর্ণরূপে একজন শিখ বানিয়ে দিল। আর আমার দুই সাথী তাদেরকে কভার করার জন্যে সবজিমণ্ডি স্টেশন থেকে শাহদরগাহ পর্যন্ত ট্রেনে তাদের সাথে একই বগিতে থাকল। যখন এ দীর্ঘ পথ নিরাপদে পাড়ি দিতে সক্ষম হলো তখন আমাদের দেহে প্রাণ পাখি ফিরে এলো এবং পাকিস্তান থেকে ট্রান্সমিটার মারফত সংবাদ পেলাম যে তারা সহীহ সালামতে পাকিস্তান পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এ সংবাদে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম ও এ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ঘরোয়াভাবে এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলাম। এ অনুষ্ঠানে আমার সাথীরা ছাড়াও বাড়ির মালিক নাজির শেরওয়ানী এবং তার পড়শী আরিফও অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে আমরা আরিফের আন্ডারগ্রাউন্ড সাথীদের সার্বিক সহযোগিতায় আগামী মাস অর্থাৎ ১৯৭৩ ইং সনের জানুয়ারি মাসের প্রোগ্রাম সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করলাম। আরিফ এবং নাজির উভয়েই দৃঢ়তার সাথে

অভয় দিয়ে বলল যে, আন্ডারগ্রাউন্ডের ছেলেরা বাস্তবেই দুঃসাহসী ও অকুতোভয়। এখন তাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র সঠিক গাইড। সার্বিকভাবে গাইড করতে পারলে তাদের দ্বারা অনেক দুঃসাহসিক কাজও করানো যাবে। এমতাবস্থায় আমি তাদের বললাম, আব্দুল করিমের অনুসন্ধান এখনও অব্যাহত রয়েছে। যদিও তার তালাশে প্রথম পর্যায়ের সেই কঠোরতা এখন আর বাকি নেই। তদুপরি দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমান বস্তিগুলোর প্রতি ভারতীয় বাহিনী ও পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি এখনও রয়েছে। এটা হলো আমার ও আমার সাথীদের রায়। আমি তাদের বললাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা একদম নরমাল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সতর্কতামূলক নতুন কোন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তারাও আমার কথায় একমত পোষণ করল। আমাদের কাছে জানুয়ারির মিশনের জন্যে অনেক সময় হাতে রয়েছে। তাছাড়া আমরা তড়িঘড়ি করে কোন কর্মসূচী হাতে নিতে চাই না।

পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের পর আমার বস আমাকে জানালেন যে, আব্দুল করিমের সরবরাহকৃত ডায়েরি পাওয়া মাত্রই আমরা আমাদের বাহিনীকে ঐ সকল গাদ্দারদের অনুসন্ধানে এবং LANCE SURVEIL করার জন্য সমগ্র পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিয়েছি। এর ফলশ্রুতিতে ভারতীয় এজেন্টদের কয়েকটি গ্রুপ ট্রান্সমিটার সহকারে ধরা পড়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভারতে পাচারকৃত তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাদের শ্যুট করে দেয়া হয়েছে। জবানবন্দির পর তারা বলেছে যে, আমাদের দেশের চলমান ব্যবস্থায় যে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ ও আদালতের মারপ্যাচে দিনাতিপাত করার ধৈর্য আমাদের নেই। তাই যা করার দ্রুত করুন।

তাদের সাথে ট্রান্সমিটার পাওয়াই হচ্ছে তাদের গাদ্দারীর বড় প্রমাণ। আর গাদ্দারের শাস্তি আমাদের বিচারে মৃত্যু। তাছাড়া সেই ডায়েরির তথ্যানুপাতে রাজনীতিবিদ, সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসার ও সাধারণ কর্মচারী এবং সন্দেহভাজন ব্যবসায়ীদের পিছনে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রমাণ জমা করা হয়েছে। তারপর ১৯৭৩ সনের মার্চ মাসে তাদের গ্রেফতারী কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরকারী আমলাদের চাকরিচ্যুত করে শাস্তি দেয়া হয়েছে। তাদের চেয়ে মর্মান্তিক শাস্তি দেয়া হয়েছে প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ীদের যাদের মধ্য থেকে কেউ তো আত্মহত্যা করেছে; আর

কাউকে আজীবনের জন্য গায়েব করে দেয়া হয়েছে। আর বাদ বাকি গাদ্দার রাজনীতিবিদদের জেল-হাজতে পাঠানো হয়েছে। মোটকথা, আমরা পাকিস্তানে বিরাজমান ভারতীয় সকল গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছি।

ভারতে আমাদের গ্রুপের সফলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটাই যে, যখন আমরা ভারতে প্রবেশ করেছি তখন আমরা আমাদের বসের নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম এবং এটা আমাদের কর্তব্য। আর এখন অবস্থা এই যে, আমাদের অবিশ্বাস্য সফলতা আমাদেরকে বিশ্বস্ততার চূড়ায় সমাসীন করেছে। ফলে আমাদের বস এখন আমাদের পরামর্শে কাজ করেন। এসবের পিছনে রয়েছে সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ ও অসীম দয়া ও করুণা যিনি আমাদের এই মঞ্জিলে পৌঁছিয়েছেন।

আমি এবারে ডাকে একটি নতুন পয়গাম পেলাম যে ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ অস্ত্র ও গ্রেনেডের প্রয়োজন হয় তবে নতুন কোড ব্যবহার করে দিল্লীতে অবস্থানরত আমাদের এক সহযোগী থেকে সংগ্রহ করতে পারব। আর সেই সহযোগীকেও আমার সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। সাধারণ প্রয়োজন পূরণের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া স্বল্প সংখ্যক টাকার প্রয়োজন হলে পুরাতন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

ডিএমআই-এর কবলে

আব্দুল করিমকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়ার পর এক সন্ধ্যাবেলা আমি কর্নেল শংকরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। দীর্ঘদিন যাবত তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ না থাকার কারণে আমার ব্যাপারে তার মনে সন্দেহের জন্ম দিতে পারে। সার্ভিস ক্লাবে সিভিলিয়ানদের প্রবেশের ব্যাপারে এমন কিছু নিয়ম চালু করা হয়েছে যে, যার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় সে যদি লিখে সাক্ষাতের ক্লিয়ারেন্স দেয় তবেই নাম, ঠিকানা ও সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হয়, অন্যথায় নয়। তাছাড়া প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাতপ্রার্থীকে খাতায় স্বাক্ষর করে সময় লিখতে হয়। এতগুলো ঘাট পেরিয়ে আমি যখন কর্নেল শংকরের নিকট পৌছলাম তখন তিনি এক গাল মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। কর্নেল পূর্বের নির্ধারিত স্থানেই আড্ডা জমিয়েছেন। আমি গিয়ে তার কাছে বসলাম এবং এতদিন দেখা-সাক্ষাত না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করলাম যে, আমি বোম্বে গিয়েছিলাম এবং বোম্বে থেকে আসার পর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। যার কারণে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারিনি। এবার কর্নেল বললেন, অনুদ! এ সময় না এসে খুবই ভাল করেছ। আব্দুল করিম আমাকে মহাবিপদে ফেলে পালিয়ে গেছে। আমি কর্নেল শংকরের কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানতে চাইলাম। জবাবে তিনি শুধুমাত্র এতটুকুই বললেন যে, আব্দুল করিম আমার সাথে সাক্ষাতকারী এক ব্রিগেডিয়ারের ব্রিফকেস নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। সেই ব্রিফকেসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোন হদিস পেলাম না।

এখন কর্নেল শংকর ও সেই ব্রিগেডিয়ার ইনকোয়ারীর অপমানজনক দুঃসময় অতিক্রম করছেন। কর্নেল পূর্ব থেকেই ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা ভুলার জন্য মদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার উপর এখন এই নতুন বিপদ। তার উদাহরণটা হল এমন যেন, মরার উপর খাড়ার ঘা। ফলে তিনি বোতলের পর বোতল শেষ করে চলছেন।

এবার কর্নেল আমার কানে কানে বললেন, এই সিভিল ড্রেস পরা দুইজন লোক হচ্ছে আমার নতুন দারোয়ান। তারা আমাদের গোয়েন্দা

বিভাগের লোক। আমাকে এবং আমার সাথে সাক্ষাতকারীদের নজরদারি করার জন্যই তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। একজন কর্নেলের সামনে ICO র‍্যাংকের লোক ও সাধারণ সিপাহী গোয়েন্দাবৃত্তি করবে এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে? শুধু তাই নয়, আমার চেয়ে বহু নিচের র‍্যাংকের যুবক অফিসাররা আমার কাছে তদন্ত করতে এসে মুখে স্যার শব্দের উচ্চারণে খই ফোটে ঠিকই তবে এমন এমন অশ্লীল ও অপমানজনক প্রশ্ন করে যার কারণে আমার মন চায়, আমি তাদেরকে শ্যূট করি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তদন্তের পর আমাকে যদি সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার না করা হয়, তবে আমি নিজেই সেনা নিবাস ত্যাগ করবো। এ বেইজ্জতের যিন্দেগী আর সহ্য করতে পারছি না। খোদ গোয়েন্দা বিভাগই আব্দুল করিমের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আমাকে দিয়েছে। এখন সে ব্রিফকেস নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এতে আমার কি অপরাধ? ভুলতো সেই ব্রিগেডিয়ারের যে এমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র যা অফিস থেকে বের করারই অনুমতি নেই তা ব্রিফকেসে ভরে বাইরে ঘুরাফিরা করছে। তদন্ত যেহেতু ব্রিগেডিয়ারের অফিসের লোকেরা করছে তাই সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছে। আজকে তুমি আমার কাছে এসেছ। আগামীকালই গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তোমার হোটেলে পৌঁছে যাবে। তোমাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে তোমার মাথা নষ্ট করে দিবে। এতে তুমি ঘাবড়ে যেও না এবং ভয় পেয়ো না। বরং নির্ভয়ে প্রত্যেক প্রশ্নের সমুচিত জবাব দিও। যদি আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তবে বলো যে, আমাদের প্রথম সাক্ষাত আজ হতে কয়েকদিন পূর্বে আকবর হোটেলের এক ড্রেস শোতে হয়েছে। মনের মিলের কারণে পরবর্তীতে সাক্ষাত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিও এ কথাই বলব। তবে দু'জনেরই কথা এক হবে। আমি বললাম, কর্নেল সাহেব! আমি যদি বিন্দুমাত্রও জানতে পারতাম যে, পরিস্থিতি এত নাজুক তবে এখানে আসতাম না। কর্নেল বললেন, এটা ঠিক নয়। বরং আজ আমার কাছে তোমার আগমন আমার ও তোমার উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক। পক্ষান্তরে তুমি যদি না আসতে তবে আব্দুল করিমের উধাও হওয়ার পর তোমার না আসা আমাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিত। এখানে তোমার আগমনই তোমার সাফাইর জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া আমি তোমাকে বলব যে, আজ থেকে আমার কাছে তোমার আসা-যাওয়া আরো বাড়িয়ে দাও। সন্দেহের লেশমাত্রও যেন তাদের মন থেকে মুছে

যায়। আরো কতক্ষণ বসার পর অতি সত্বর সাক্ষাতের ওয়াদা করে অনুমতি নিয়ে ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। এমতাবস্থায় দেখলাম সিভিল পোশাক পরিহিত দারোয়ানদের একজন আসা-যাওয়ার মাঝে অপর কোণে দাঁড়ানো আরেক দারোয়ানকে ইশারা করল। ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমি একটি ট্যাক্সি নেয়ার পরপরই অনুভব করলাম যে একটি গাড়ী আমাদের পিছু নিয়েছে। আমি এই নজরদারির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ট্যাক্সিকে ক্লাট সার্কাসে যেতে বললাম। আর সেই গাড়ি সর্বদা আমাদের পিছেই আসছে। ক্লাট সার্কাসের এক দোকান থেকে হালকা পাতলা শপিং করার পর আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে লুধি হোটেলে যেতে বললাম। লুধি হোটেল পর্যন্ত ঐ গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে। আমি তো ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে হোটেলের ভেতরে চলে গেছি। আমি জানি না সেই গাড়ি হোটেলের গেটে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। সবেমাত্র আমার Mobile Surveillance শুরু হয়েছে এবং অচিরেই Static Surveillance শুরু হবে। আমি কামরাতে চলে এলাম এবং এর থেকে বাঁচার উপায় বের করার জন্য ভাবনার সাগরে তলিয়ে গেলাম।

* * *

পরদিন ভোরবেলা আমার সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং আমার প্রতি নজরদারি শুরু হয়েছে এ সংবাদ দেয়ার জন্য হোটেল থেকে বের হলাম। হোটেলের লবিতে বসে থাকতে দেখলাম শুধুমাত্র দু'একজন বিদেশী ট্যুরিস্টকে। হোটেলের আঙ্গিনায় পার্কিং অতিক্রম করে আমি মেইন রোডে এসে পৌঁছলাম। এ সময় আমি ইচ্ছা করেই সাথে অস্ত্র আনিনি। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগুতে লাগলাম। হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার পিছন ফিরে দেখলাম কেউ আমার পিছু নিয়েছে কিনা। মানুষ ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করছে। তাদের মধ্য হতে কাউকেই আমার পিছু নিয়েছে বলে মনে হল না। আমি আমার সাইডের ও অপর সাইডের পথচারীদের চেহারাকে আমার স্মৃতির ক্যানভাসে গেঁথে নিলাম। সামনেই দেখা যাচ্ছে সিগন্যাল লাইট পোস্ট। আমি আমার গতিকে এমন রাখলাম যে সিগন্যালের সবুজ লাইট জ্বলে উঠার সাথে সাথে সিগন্যাল পোস্টের কাছে পৌঁছতে পারি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমি সিগন্যাল লাইটের কাছে চলে এলাম। সবুজ লাইট জ্বলে উঠার সাথে সাথেই রোড পার হয়ে অপর প্রান্তের ফুটপাথ ধরে ফিরে চলতে লাগলাম। পনের বিশ

মিনিট চলার পর জুতার ফিতা বাঁধার বাহানা করে মাথা নুয়ে খুব ভাল করে পিছনে তাকালাম। কিন্তু এদের মধ্যে পূর্বের দেখা পথচারীদের চেহারা দেখতে পেলাম না।

এ পদ্ধতিতে পশ্চাদপসারণকারীদের নিজেদেরকে প্রকাশ করা ছাড়া পশ্চাদপসারণ সম্ভব নয়। এতে পশ্চাদপসারণকারীদের ক্রমধারায় গড়বড় হয়ে যায় এবং পশ্চাদপসারণকারী গাড়িও ইউ টার্ন লওয়া ব্যতীত যাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সবশেষে যখন সব ঠিক পেলাম তখন আমি একটি ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সির পিছনের সিটে বসেও আমি কয়েকবার পিছন ফিরে তাকালাম। কিন্তু আমার পিছু নিতে কোন গাড়ি আসতে দেখলাম না। তারপরও অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমি ট্যাক্সিকে জৈনপুরে যেতে বললাম। সেখানে একটি বিশাল গোল চত্বর রয়েছে। যে গোল চত্বর ঘুরে আবার মেইন রোডে আসা যায়। সাধারণত এ গোল চত্বর পূর্ণভাবে আহমক ব্যতীত অন্য কেউ ঘুরে না। কিন্তু আমি এ বিশাল গোল চত্বর ঘুরে পুনরায় মেইন রোডে এসে পৌঁছলাম। এমতাবস্থায়ও আমি পিছনের ট্রাফিক পোস্টের দিকে খুব ভালভাবে তাকিয়ে ছিলাম। কোন গাড়ি আমার পিছু নিয়েছে কি না তা জানার জন্য। পরিশেষে নিশ্চিত হলাম যে কোন গাড়ি আমার পিছু নেয়নি। এখন আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ক্লাট প্লেসে যেতে বললাম। ড্রাইভার আমার কাজকর্মে পেরেশান হয়ে গেছে। সে ভেবেই পাচ্ছে না আমি কি করছি। ফলে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। আমি তাকে কোন প্রকার প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তার প্রশ্ন করার আগেই বললাম, আমি প্রত্যেক সকালে ঘুরে মুক্ত বাতাস সেবন করি। অভ্যাস মত আজও বের হয়েছি। এতে ড্রাইভারের সকল সংশয় দূর হয়ে গেল। ক্লাট প্লেস গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম এবং একটি ভাল রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তা সারলাম। নাস্তার পর রেস্টুরেন্টের পাশেই অবস্থিত পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে বাড়ির মালিক নাজির শেরওয়ানীর কাছে ফোন করলাম এবং আমার দুই নম্বর সাথীকে ডেকে দিতে বললাম। আমার দুই নম্বর সাথী ফোন ধরার পর আমি তাকে বললাম, আমাকে নজরদারি করা হচ্ছে। তাই আমার পক্ষ থেকে লাইন ক্লিয়ার না পেলে ও আমার নজরদারি খতম না হলে আমার হোটেলে ফোন করবে না এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেও আসবে না।

প্রত্যেহ সকাল দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ফোন করে তোমাদের খোঁজ-খবর নিব। নির্দিষ্ট সময়ে যশোবন্ত থেকে ডাক আদান-প্রদান করবে। ট্রান্সমিটার যোগে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করতে কোন প্রকার অলসতা করবে না। আমি ফোন করলে বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে দিবে। আমার দুই নম্বর সাথী আমার নজরদারির কথা শুনে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। তারপর সে আমাকে পরামর্শ দিল, আমাদের কারাতে কুংফুতে দক্ষ সাথী লাইন ক্লিয়ার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার সাথে হোটেলে একটি কামরা ভাড়া নিয়ে হোটেলে আপনাকে কভার দিলে ভালো হয়। আমি তার পরামর্শে একমত হলাম। একথার উপরই ফোনের কথা শেষ করলাম। তারপর অশোকা হোটেলে গিয়ে ট্যুরিস্ট বাসে করে সারা দিল্লী চক্কর লাগালাম। এ সময় আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ করলাম, পূর্বের কড়া চেকিংয়ে কিছুটা ভাটা পড়েছে। সম্ভবত তারা আব্দুল করিমের দিল্লীতে অবস্থানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। বিকাল চারটার দিকে হোটেলে ফিরে এসে দেখি আমার সেই সাথী হোটেলের লবিতে বসে আছে। আমি রুমের চাবির জন্য রিসিপশনিস্টের কাছে যাওয়ার পর সেও সেখানে এলো এবং একটু উঁচুস্বরেই তার কামরার চাবি চাইল। তার কামরাও আমার কামরার মত ফরেস্ট ফ্লোরে অবস্থিত হওয়ায় মনে একটু ভরসা পেলাম এই ভেবে যে, আল্লাহ না করুন যদি কোন অঘটন ঘটে যায় তথাপিও কোন ভয় নেই। কেননা এখানে আমি একা নই। রিসিপশন থেকে আমাকে জানানো হল, দুইজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিল। পরবর্তীতে আবার আসার কথা বলে চলে গেছে। রিসিপশন থেকে এর বেশি কোন খবর আমি পেলাম না। পরদিন সকাল বেলা রিসিপশনের সকালের ঐ ছেলের মাধ্যমে জানতে পারলাম যাকে আমি মাঝে মাঝে টাকা পয়সা বখশিস দিতাম তারা আমার হোটেলে অবস্থানের প্রথম দিন থেকে অদ্যাবধি আমার তৎপরতা সম্পর্কে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এ সংবাদ শুনার পর আমি আমার দুটো পিস্তল গুলি ছুরি এবং আমার মূল পরিচয়পত্র সবকিছু নিয়ে সাথীর কামরায় রেখে আমার কামরায় ফিরে এলাম। এখন আমার কামরায় আমার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বস্তু ছাড়া কয়েকটি খোলা চায়ের প্যাকেট রয়েছে। তাই আমি তদন্তকারীদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হলাম।

*　　*　　*

সকাল নয়টায় আমার টেলিফোন সেটটি ক্রিং ক্রিং বেজে উঠলো। আমি রিসিভার উঠালাম। অপর প্রান্ত থেকে রিসিপশনিস্ট জানাল যে, দুইজন ভদ্রলোক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য হোটেল লবিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি রিসিভার রেখে ড্রেস চেঞ্জ করলাম। তারপর আমার সাথীর দরজার সামনে গিয়ে বিশেষভাবে করতালি বাজিয়ে লবিতে চলে এলাম। লবিতে এসে দেখলাম দেশি-বিদেশী মিলিয়ে কয়েকজন লোক বসে আছে। তাদের মধ্য হতে দুইজন আমাকে দেখামাত্র বসা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং আমার দিকে এগিয়ে এল। সম্ভবত তারা গতকাল সন্ধ্যায় রিসিপশন থেকে আমার অবয়ব আকৃতি জেনে নিয়েছে। ফলে তারা আমার কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করল, জনাব! আপনার নাম কি? জবাবে আমি বললাম, অনুদ। তারা বলল, আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এবং কিছু তথ্য জানতে চাই। আমি তাদের বললাম, আপনাদের পরিচয়? জবাবে তারা বিনয়ের সাথে বলল, আমরা সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছি। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে মধ্যবয়সী অপরজন যুবক। তাদের নিয়ে আমি কফিশপে এলাম ও তাদের জন্য কফির অর্ডার দিলাম। এরই মধ্যে আমার সাথীও অন্য এক টেবিলে এসে বসে গেছে। বাহ্যিকভাবে যদিও সে চা পান ও পত্রিকা পাঠে মগ্ন বাস্তবে তার মনোযোগ আমাদের দিকেই রয়েছে। ততক্ষণে টেবিলে কফি এসে গেল। এবার আমি তাদের দিকে কফি পেশ করে বললাম, আমি আপনাদের কি খেদমত করতে পারি বলুন। প্রতিউত্তরে মধ্যবয়সী লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি করেন? জবাবে আমি বললাম, আমি খোলা চায়ের BLENDER এর বেপারী। আমি বোম্বেতে থাকি। গত কয়েক মাস যাবত ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির জন্য দিল্লীতে অবস্থান করছি। তাছাড়া পাঞ্জাবে, হরিয়ানা, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশে আমার চা উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমার কথা শেষ করতে না করতেই সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সাথে কর্নেল শংকরের কিসের সম্পর্ক? আমি বললাম, কর্নেল শংকরের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ সম্ভবত আকবর বা অশোকা হোটেলের কোন এক ড্রেস শোতে হয়েছে। উভয়ের মেজাজ এক হওয়ায় প্রথম সাক্ষাতেই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি। যার ফলশ্রুতিতে আমার অবসর সন্ধ্যা কর্নেল শংকরের সাথেই কাটাই। আজ বিকেলেও তার কাছে যাব। গত

পরশুও আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। এবার তাদেরকে বললাম, আপনারা এখনও কিন্তু আমাকে বলেননি যে, এই জিজ্ঞাসাবাদের হেতু কি? আমি দেশের জন্য যে কোন ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন তো! এখন তারা আমার কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলতে লাগলো। এবার আমি একটু রাগতস্বরেই বললাম, আমি এখনও পর্যন্ত আপনাদের পরিচয়পত্রও দেখিনি। তদুপরি আপনাদের কথার উপর ভরসা করে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এখন আমি আপনাদের কোন প্রশ্নের জবাবই দিব না– যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এ জিজ্ঞাসাবাদের কারণ আমাকে বলবেন। আমি কোন অপরিচিত লোক নই। সেন্ট্রাল মিনিস্টার থেকে নিয়ে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথেও আমার সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া আজ সন্ধ্যায় কর্নেল শংকরের কাছে গিয়ে আমার কাছে আপনাদের আগমনের কথাও জানাব। আমার এ ধমকি তাদের উপর বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাত হানল। যার দরুন কথার মোড় ঘুরে গেল। এবার তারা কাচুমাচু হয়ে মিনতি করে বলতে লাগলো, জনাব! আমাদের ভুল হয়েছে। ভুল বুঝে আমরা এখানে এসেছি। আর ভুল তো মানুষই করে থাকে। তাই দয়া করে এ সাক্ষাতের কথা ভুলে যান। এর যবনিকা এখানে টানেন। একে আর দীর্ঘ না করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এক স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমি সরকারী ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করি এবং আমি সরকার বিরোধী কোন কাজের সাথে জড়িত নই। আর আপনারা না জেনে না বুঝে আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। আর আমি একজন সভ্য শান্ত নাগরিকের মত আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছি। আমার এ সকল কথায় তারা একদম কাবু হয়ে গেল এবং করজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বিদায় হল।

এ সময় আমি মানসিকভাবে এতই দুর্বল যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। আমি এটাও জানি, ভবিষ্যতে এ অবস্থা আরও ঘোরতর হবে। তাই আমার ভয়ভীতি থাকা সত্ত্বেও তাদের দুর্বল করার জন্য সম্ভাব্য সকল শক্তি নিয়োগ করলাম। ফলে তারা দুর্বল হয়ে বিদায় নিয়েছে ঠিকই তবে এ যাওয়া শেষ যাওয়া নয়; বরং এ নজরদারির ধারাবাহিকতা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে। তাদের বিদায়ের পর আমি কফিশপ থেকে উঠে আমার কামরায় চলে এলাম। আমার আসার কয়েক মিনিট পর

আমার সাথীও চলে এল। আমি আমার কামরার দরজা ইচ্ছা করেই খোলা রেখেছি। আমার সাথী আমার কামরার সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বললাম, তুমি বাকি সাথীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বল যে, সব ঠিক আছে। কোন চিন্তার কারণ নেই। আর সামনের কয়েকদিন তুমিই তাদের সাথে যোগাযোগ করবে। তার যাত্রার পূর্বক্ষণে তাকে ছয় হাজার টাকা দিয়ে বললাম যে, যশোবন্ত থেকে ডাক গ্রহণ করার সময় প্রত্যেক ডাকের বিনিময়ে তাকে দুই হাজার করে টাকা দিবে। আর যশোবন্ত যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে তবে তাকে বলবে, আমি কয়েকদিনের জন্যে দিল্লীর বাইরে গেছি।

* * *

দুপুরের পর আমি হোটেল থেকে বের হয়ে একটি ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সি করে কিছুদূর যাওয়ার পর অনুভব করলাম, একটি গাড়ি আমাকে ফলো করার জন্য পিছু নিয়েছে। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক সেদিক চক্কর লাগিয়ে ক্লাট প্লেসে গিয়ে পৌঁছলাম। স্টেশনারীর এক বড় দোকান থেকে কিছু দ্রব্য খরিদ করে সোজা হোটেলে ফিরে এলাম। ঐ গাড়ি হোটেলে পৌঁছা পর্যন্ত পেছন পেছন এসেছে। আমি যেহেতু পিছু নেয়ার ব্যাপারে অবগত সেহেতু গাড়িকে কোন গুরুত্ব দিলাম না। সন্ধ্যাবেলা আমি কর্নেল শংকরের নিকট চলে গেলাম। যাত্রাপথে অন্য একটি গাড়ি আমার পিছু নিল। আমি গাড়ির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে কর্নেল শংকরের কাছে সংক্ষিপ্তভাবে সকালের ঘটনা ব্যক্ত করলাম। জবাবে কর্নেল শংকর বললেন, কয়েক দিনের মধ্যেই এ নজরদারির ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাবে। এ নজরদারি তাদের রুটিন কাজ। কর্নেল শংকরের কথা অনুযায়ী আরও কয়েকদিন এ নজরদারি অব্যাহত থাকল। তারপর তেলহীন প্রদীপ যেভাবে নিভে যায় ঠিক তেমনিভাবে তাদের নজরদারীর ক্রমধারাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। এরপরও আমি আরও দু'বার কর্নেল শংকরের সাথে সাক্ষাত করলাম। সাক্ষাতে সে আমাকে বলল, আমি জেনারেলের কাছে আমার এবং তোমার প্রতি নজরদারি এবং জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট করেছি। কর্নেল শংকর আর্মি হেড কোয়ার্টারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। এ বিভাগে তার পোস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কর্নেল শংকর এ আকস্মিক ঘটনার সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়। যার দরুন জেনারেল তার এ রিপোর্টের মূল্যায়ন করেছেন এবং গোয়েন্দা

বিভাগে নোটিশ পাঠিয়েছেন। যার কারণেই তার এবং তার বন্ধুদের প্রতি নজরদারির ক্রমধারা হঠাৎ করে একদিন বন্ধ হয়ে যায়। নজরদারি বন্ধের পরও আমার সাথী আরও দশদিন হোটেলে অবস্থান করে। তারপর হোটেল ত্যাগ করে সাথীদের কাছে চলে গেছে। তার চলে যাওয়ার দুই দিন পর সতর্কতার সাথে ZIG ZAG পথ দিয়ে সাথীদের কাছে গেলাম। আরও কয়েকদিন কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের পর আমরা সকলেই পূর্বনির্ধারিত রুটিন মাফিক কাজ শুরু করলাম।

* * *

আমি একদিন নাজির শেরওয়ানী ও আরিফের সাথে মিটিং করলাম। মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, নববর্ষের রাতে একটা হট্টগোল বাধাব। নববর্ষের আনন্দে ৩১ শে ডিসেম্বরের রাতে সাধারণত গুলি ছোঁড়া হয়। আমি তাদেরকে বললাম, যখন এ রাতের ঠিক বারটা বাজে তখন বড় বড় হোটেলের হলরুমে এক মিনিটের জন্য একদম অন্ধকার করে দেয়া হয়। এ সময়ে যদি আকবর বা আশোকা হোটেলে ককটেল ফাটানো হয়, তবেই একটা বিরাট হট্টগোল সৃষ্টি হবে। কেননা রাতে আর্মি, নেভী ও এয়ার ফোর্সের অফিসাররাও সেখানে উপস্থিত হবে। হলে যখন ককটেল ফাটবে তখন উপস্থিত জনতার মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়বে। চিল্লাচিল্লি ধাক্কাধাক্কিতে মানুষের বহু ক্ষয়ক্ষতিও হবে। এ ঘটনা পরদিন সকালে খবরের কাগজের হেড লাইনে ছাপা হবে। তাছাড়া এটা হচ্ছে আমাদের ঐ অপারেশনের রিহার্সেল যা আমরা ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্যারেডের মাঝে করতে চাই। নাজির এবং আরিফ আমাকে পরিপূর্ণরূপে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলল, এ সকল কাজ আন্ডারগ্রাউন্ডের মুসলিম যুবকেরাই করবে। আপনি শুধুমাত্র তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিবেন। আমি তাদেরকে বললাম, তবে ঐ ছেলেদের সাথে আমাকে সাক্ষাত করাতে হবে। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে ঐ ছেলেদের মাঝে ভারত সরকারের কোন স্পাইও থাকতে পারে। তাই তাদের সাথে আমাকে সাক্ষাত করানোর সময় আমার মূল পরিচয় ও আমার সাথীদের ব্যাপারে কোনকিছু না বলাই উত্তম হবে। পরিশেষে এটা সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা আমাকে সেই ছেলেদের লিডারের সাথে সাক্ষাত করাবে। আর আমি তাকে দিকনির্দেশনা দিব। আর সে সে অনুযায়ী ছেলেদের দ্বারা কাজ করাবে।

পরদিনই দুই নম্বর সাথীর মাধ্যমে সংবাদ পেলাম, সন্ধ্যা ছয়টায় ঐ ছেলেদের লিডারের সাথে সাক্ষাত করতে যেতে হবে। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আমি সাথীদের কাছে চলে গেলাম। নাজির ও আরিফ তৈরি ছিল। ফলে কালবিলম্ব না করে আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। আরিফ ড্রাইভারকে ছাত্তা লাল মিঞা যেতে বলল। ছাত্তা লাল মিঞা নামক স্থানে পৌঁছার পর আমরা ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। তারপর আরিফ আমাদেরকে নিকটবর্তী এক গ্যারেজে নিয়ে গেল। সে গ্যারেজের কর্মচারী এক ছেলেকে কি যেন বলল। তারপর ঐ ছেলে আমাদেরকে গ্যারেজের অন্দরে ড্রয়িংরুমের মত একটি কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে একজন লোক হাসি মুখেই আমাদেরকে স্বাগত জানাল এবং পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের নাম বশীর আহমদ বলল। এ নাম শুনে আমি কিছুটা চমকে গেলাম। এই কারণে যে, যশোবন্ত ইতোপূর্বে আমাকে বলেছে, ছাত্তা লাল মিঞায় বশীরের গ্যারেজ থেকেই সে চাবি বানিয়েছে। পরিচয় পর্ব ও কুশল বিনিময়ের মাঝেই চা এবং শুকনা ফ্রুট আমাদের সামনে এল। অল্প সময়ে আপ্যায়নের এ ব্যবস্থাপনা জানান দিচ্ছে, বশীরকে আরিফ এ বৈঠক সম্পর্কে ইতোপূর্বেই জানিয়েছে। অন্যথায় এ অল্প সময়ে এ আপ্যায়ন সম্ভব হতো না। এবার কোন ভূমিকা না টেনেই বশীর বলতে লাগলো, গ্যারেজের কাজ তো না হওয়ার মতই। বিশেরও বেশি ছেলে আমার কাছে কাজ করে। অথচ সপ্তাহে একটি গাড়িও মেরামত করতে আসে না। আমার এই ছেলেদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমাকে অনেক অবৈধ কাজ করতে হয়। জনাব! হিন্দু বেশে আমরা তো মুসলমানদের তীব্র ঘৃনা করি। তারপরও তারা অবৈধ কাজ করানোর জন্য আমাদের কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। এর বিনিময়ে অনেক টাকা পয়সাও দেয়। পক্ষান্তরে যদি অস্বীকার করি তখন সুপারিশ করার জন্য নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে আসে। এত কিছু জানা সত্ত্বেও আমি প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ কাজ করে থাকি। তাদের এ সাহস নেই যে, আমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ করবে। তাছাড়া এলাকার পুলিশও আমাদের ব্যাপারে চোখ কান বন্ধ করে রাখে। এর কারণ হল এই যে, আমার ছেলেরা সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আর আমি তাদেরকে রামের (এক ধরনের চাকু) ব্যবহার খুব ভালভাবে শিখিয়েছি। কয়েক মাস পূর্বে এখানে একজন থানার ওসি এল। সে আমার কাছে কয়েকবার সংবাদ

পাঠাল থানায় যাওয়ার জন্য। এক পর্যায়ে সে আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তাহলে একদিন আমি থানায় গেলাম। আমি থানায় এসে ওসিকে সংবাদ দিলাম যে, আমি থানায় এসেছি। ওসি সাহেব বাস করতো করোলবাগ এলাকাতে। ওসি সাহেব আমার ফোন পেয়ে যেই বাসা থেকে বের হলেন তখনই করোলবাগের ছেলেরা তার ভুড়ি বের করে ফেলল। আমি থানায় বসা অবস্থাতেই ওসির লাশ থানায় আনা হল। থানার লোকেরা জানতো, এর পিছনে আমার হাত রয়েছে। তদুপরি তাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না। ছেলেরা অপারেশন সেরে প্রত্যেকের এলাকায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এটা হচ্ছে মুসলমান এলাকা। এখানে অনেক কঠিন কঠিন ওসি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেউই থানায় কাগজের পেট ভরা ছাড়া বাস্তবে কোন কিছু করতে পারেনি। এই হিন্দুরা শুধুমাত্র দুর্বলদের উপর নির্যাতন চালাতে পারে। যদি কেউ চোখে চোখ রেখে কথা বলে তখনই তারা ভিজা বিড়াল হয়ে যায়। বশীরের এতক্ষণ পর্যন্ত কথা দ্বারা বুঝলাম যে, প্রথম সাক্ষাতেই সে আমার উপর প্রভাব ফেলতে চায়। তদুপরি আমি বশীরকে বললাম, আমরা ৩১শে ডিসেম্বরের রাতে কয়েকটি স্থানে ধামাকা করতে চাই। এজন্য দুঃসাহসী ও চৌকস কয়েকজন ছেলের প্রয়োজন।

আমার কথা শুনে বশীর হেসে উঠলো এবং বলল, আমার ছেলেরা তো এমন দুঃসাহসী ও নির্ভীক যে, আমি যদি তাদেরকে বলি চাকু নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিবে। যেখানে বলবেন সেখানে অপারেশন করতে পারবে। এতে তারা বিন্দুমাত্রও ভয় পাবে না। আমি তো এখানে গুলি ছাড়া হ্যান্ড গ্রেনেডও তৈরি করি। আমার কাস্টমার ছড়িয়ে আছে মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে নিয়ে সমতল অঞ্চলের সর্বত্র।

আরিফ বশীরকে আমার সম্পর্কে পূর্বেই বলা ছিল। ফলে সে আমার কাছে কোন প্রকার প্রশ্ন করেনি। বশীরের মত কম শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক যারা অবৈধ কাজের সাথে জড়িত তারা যদি নিজ ধর্মের কল্যাণমূলক কোন কাজের সুযোগ পায় তখন তারা জীবন বাজি রেখে কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ভারতে বশীরের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে ঐ সকল মুসলমান বেকার যুবকের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেছে যারা অর্থনৈতিকভাবে দৈন্য দশার শিকার। তাছাড়া ভারতে বেশভূষায় মুসলমান হওয়াই হচ্ছে বড় অপরাধ। এ নির্যাতনের কারণে ছেলেরা তার দলে জমায়েত হয়েছে।

সাধারণত বশীর তাদের দ্বারা অবৈধ কাজই করিয়ে থাকে। তবে তার কাজগুলো সুশৃঙ্খল নয়। যখন যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই সে তাদের দ্বারা ফায়দা লুটে। এর কারণ হচ্ছে একে তো সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। অপরদিকে তার নেই কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য। তাই আমি চিন্তা করলাম, ৩১শে ডিসেম্বর সে যদি আমার চাহিদানুযায়ী কাজ করে তবে আমি তাকে আমার সাধ্যানুযায়ী প্রশিক্ষণ দিব এবং তার সাথীদের একটি ইউনিট হিসেবে সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করব।

আমি বশীরকে বললাম, যদি সম্ভব হয় তবে তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষিত, দুঃসাহসী ও নির্ভীক ছেলেকে আমার সাথে সাক্ষাত করাবে, কেমন? আর মনে রাখবে। নববর্ষের রাতে আকবর ও অশোকা হোটেলে টেবিলের রিজার্ভেশন শুধুমাত্র জোড়াদের জন্যই সম্ভব। এই গেদারিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য সুন্দর পোশাক ছাড়াও পার্সোনালিটিরও প্রয়োজন রয়েছে। আমি ছেলেদের সঙ্গ দেয়ার জন্য মেয়েদের ও পোশাকের ব্যবস্থা করব। এর জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। বশীর দুইদিন পর সন্ধ্যায় তার নির্বাচিত ছেলেদের সাথে সাক্ষাত করানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করলো। রাতের খানা খাওয়ার জন্য বশীরের শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও দুইদিন পর সাক্ষাত করার ওয়াদা করে আমরা চলে এলাম।

আমি সাথীদের কাছে এসে আলোচনা বিস্তারিত বললাম। তারপর আমরা নিজেদের জন্য এই প্রোগ্রাম তৈরি করলাম যে, আমরা কেউ সেই রাতে আকবর ও অশোকা হোটেলের ধারেও যাব না। আমি লুধি হোটেলে মাঝারি ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবো। আর তোমরা কারোনেশন হোটেলে রাত কাটাবে।

দুই দিন পর নাজির আরিফ ও আমি আবার বশীরের গ্যারেজে গেলাম। আপ্যায়ন পর্ব শেষ করার পর বশীর তার শিষ্যকে ডাক দিল। শিষ্য তার সাথে চারজন ছেলেকে নিয়ে এল। যাদের বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যেই হবে। অবয়ব আকৃতিতে তাদেরকে সম্ভ্রান্ত পরিবারেরই মনে হল। তারা একজন একজন করে আমাদের সাথে মুসাফাহা করে ভদ্রতার সাথে বসে পড়লো। আমি তাদেরকে নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তারা তাদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বলল। তাদের দুইজন হচ্ছে আইএ, একজন বিএ আর একজন মেট্রিক পাশ। বশীর বলল, আমি তাদেরকে পূর্বেই বলেছি, কি কাজ করতে হবে। তারা

এ কাজকে সাদরে গ্রহণ করেছে। আমি এই ছেলেদের দেখে ও তাদের সাথে আরও কতক্ষণ আলোচনার পর প্রোগ্রামে সামান্য পরিবর্তন করলাম। আর তাহলো, দুই হোটেলে দুইজন করে দুই জোড়া পাঠাব। এ পরিবর্তন এজন্য করলাম যে, এক মিনিটের অন্ধকারে একজন লোক শুধুমাত্র একটি ককটেলই ফাটাতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি দুইজন হয় তবে হলের দুই দিক থেকে একযোগে আঘাত হানতে পারবে। তাতে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক আরও কয়েকগুণ বেশি হবে। আমি ছেলেদেরকে পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তারা বলল, তাদের কাছে গাঢ় রঙের স্যুট ও ওভারকোট রয়েছে। এবার বশীর বলল, আমি তাদেরকে চেপ্টা ককটেল বানিয়ে দিব যা সহজেই পোশাকে লুকানো যাবে। তবে তা বহনে হাল্কা হলেও কাজে হবে খুবই শক্তিশালী। আমি ছেলেদের বললাম, বাতি নিভামাত্রই ককটেল বের করতে হবে এবং হলের মাঝখানে ছুঁড়ে মারতে হবে। আমি চাচ্ছিলাম যে আলো নিভার সাথে সাথে অন্ধকারের মাঝেই ককটেল ফাটুক। একদম অন্ধকারে লোকে লোকারণ্য হলে ককটেল ফাটলে কেমন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম হতে পারে তা জ্ঞানবান মানুষ সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

আমি বশীরকে বললাম, ককটেলের সাথে বারুদী বাতি এমন ছোট দিবে যাতে ৬ সেকেন্ডের মধ্যেই ককটেল ফাটতে পারে। তারপর বললাম, আমি এই ছেলেদের নিকট থেকে শপথ নিতে চাই। তারা তখনই তৈরি হয়ে গেল শপথ বাক্য পাঠ করার জন্য। আমি তাদের থেকে শপথ নিলাম, "আমরা এই মহান কাজ সুস্থ মস্তিষ্কে দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন করবো। আল্লাহ না করেন, যদি কোন সমস্যার কারণে গ্রেফতার হই তবে আমাদের পরিচিতি ও সাথীদের নাম কাউকে বলব না।"

আজ বশীর একটু চালাকি করেছে। সে আমাদের না জানিয়েই খানার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। যেই আমি শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে শেষ করলাম ছেলেরাও বিদায় হল তখনই সে একদম গরম খাবার আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করলো। বাধ্য হয়েই আমরা সুবোধ বালকের মত এক সাথে বসে রাতের খাবার শেষ করলাম। বিদায়ের পূর্বক্ষণে বশীরকে বললাম, ভাই বশীর! তুমি আমাদের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছ এর প্রকৃত প্রতিদান একমাত্র আল্লাহই তোমাকে দিবে। তবে এ কাজ করতে গিয়ে

যদি কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন মনে কর, তবে তা আমি ব্যবস্থা করতে পারি। আমার এ কথায় বশীর কালবৈশাখী ঝড়ের ন্যায় আঘাত পেল। দুঃখে ও কষ্টে তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা একদম মলিন হয়ে গেল। ভাদ্র মাসের প্রবল বর্ষণের ন্যায় তার দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো আক্ষেপের তপ্ত অশ্রু। অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে এক সময় সে ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে গেল। তারপর কাঁদকাঁদ স্বরে বলতে শুরু করল, ভাইজান! টাকা কামানোর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। আমি যখন বৈধ পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করতে ব্যর্থ হলাম তখন বৈধ ও অবৈধ সকল পথই বেছে নিলাম। এখন আমি শুধুমাত্র বহু টাকার মালিকই নই বরং আমার টাকা প্রতিনিয়ত চক্রহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ছেলেরা আমার থেকেই টাকা নিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। আপনি এবং আপনার সাথীরা জীবনবাজি রেখে যে কাজ করার জন্য এ শত্রুদেশে এসেছেন পরিপূর্ণভাবে না হলেও সে কাজের গুরুত্ব কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছি। পাকিস্তান ইতোপূর্বেও ইসলামের দুর্গ ছিল, এখনও আছে। আমার উপর আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ করবেন যদি আপনার এ মূল্যবান কাজে যৎসামান্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এর বিনিময় গ্রহণ করি। আমি তো আমার জান এবং মাল ইসলামের জন্য কুরবান করতে প্রস্তুত। ভাইজান! টাকার কথা বলে আপনি আমাকে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। বশীরের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, না জেনে এমন কথা বলা ঠিক হয়নি। তাই সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলাম এবং বললাম, ভাই বশীর! তোমার মনে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তুমি আমাকে বড়ভাই হিসাবে ক্ষমা করে দাও। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, এ শত্রুদেশে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ তোমাদের মত অকুতোভয় যুবক থাকতে পারে। তুমি তোমার কথায় বলেছ যে পাকিস্তান ইসলামের একটি দুর্গ। বাস্তবেই পাকিস্তান তোমাদের মত এমন ইসলামের তরে নিবেদিতপ্রাণ লোকের কারণে ইসলামের দুর্গ। যেমনিভাবে রাতের গভীর অন্ধকার বলে দেয়, সকাল অতি নিকটে ঠিক তেমনি সেই দিন বেশি দূরে নয় যে এ ভারত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ইসলামের হিলালী নিশান ভারতের বিধান সভায় পত পত করে উড়বে। তারপর আমরা বশীরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

* * *

এই সাক্ষাতের পর আমি বশীর ও সেই চার ছেলের সাথে আরও দুবার সাক্ষাত করলাম। সাক্ষাতে তাদেরকে ৩১শে ডিসেম্বরের রাতের ব্যাপারে উত্তমরূপে ব্রিফ দিলাম। এর মাঝে বশীর চেপ্টা ককটেল তৈরি করে ফেলল। ককটেলের ওজন ও পুরুত্ব দেখে উপলব্ধি করলাম, বস্তু যদিও ছোট কিন্তু ধামাকা বড় বোমের মতই হবে। বশীরের পক্ষ থেকে সবকিছু রেডি হওয়ার পর আমি আমার দুই নম্বর সাথীকে অশোকা ও আকবর হোটেলে পাঠিয়ে প্রত্যেক হোটেলে দুটা করে মোট চারটি টেবিল চার হাজার টাকায় রিজারভেশন করালাম। এই দুই হোটেলের লবিতে paid partner যুবতী সব সময় ঘুর ঘুর করে। সেখান থকে দুই নম্বর সাথী চারজন যুবতীকে বাছাই করে ৩১শে ডিসেম্বরের রাতের জন্য জন প্রতি এক হাজার টাকা করে বুক করল। এডভান্স হিসেবে প্রত্যেককে একশত করে টাকা দিয়ে বলল, ৩১শে ডিসেম্বরে সন্ধ্যা সাতটায় তোমরা ক্লাট প্লেসের রঙমহল রেস্টুরেন্টে আমার সাথে সাক্ষাত করবে। সম্মতিস্বরূপ সবাই মাথা দোলাল। নববর্ষের কারণে এই কলগার্লদের রেট বেড়ে গিয়েছে। অন্যথায় আরও কম টাকায় পাওয়া যেত। আমি এ সকল কাজ আমার দুই নম্বর সাথীর দ্বারা এ জন্য করিয়েছি যে, আমি তো পূর্ব থেকেই DMI -এর নজরদারিতে রয়েছি। এখন নতুন করে আবার কোন বিপদ ডাকতে চাই না। এখন ৩১শে ডিসেম্বরের কাজের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে যত প্রকারের প্রস্তুতি ছিল তা আমরা আল্লাহর রহমতে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। এখন শুধুমাত্র ৩১ শে ডিসেম্বরের অপেক্ষা।

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমি ৩১শে ডিসেম্বরের বিকাল ৫টায় বশীরের কাছে গিয়ে দেখি ছেলেরা আমার যাওয়ার অনেক আগেই এসে পড়েছে। বশীর প্রত্যেক ছেলের প্যান্টের বেল্টে ককটেল এমনভাবে সেট করেছে যে, কোট পরার সাথে সাথে তা চোখের আড়াল হয়ে যায়। তাছাড়া সে প্রত্যেক ছেলের পায়ের নালীর সাথে একটি করে খঞ্জরও বেঁধে দিয়েছে। প্রয়োজন সাপেক্ষে যেন কাজে লাগাতে পারে। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা সাতটার পূর্বেই ক্লাট প্লেসের রঙমহল রেস্টুরেন্টে আমার এক সাথীর সাথে সাক্ষাত করবে। ঐ সাথী তোমাদেরকে যুবতীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। সাথীকে চেনার উপায় হচ্ছে, তার গায়ে লাল রঙের জামা ও লেদারের জ্যাকেট থাকবে। যা দেখে সহজেই তোমরা তাকে

চিনতে পারবে। এবার আমি প্রত্যেক ছেলেকে এক হাজার করে টাকা দিতে চাইলাম। বশীর আমাকে বাধা দিয়ে বললো, কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি ওদেরকে দুই হাজার করে টাকা দিয়েছি। বশীর তাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আমি ওদেরকে বলেছি অপারেশন শেষ করে যার যেমন খুশি আজ রাতে আনন্দ করো। ৩১শে ডিসেম্বরের ভীড়ের কারণে অনেক অপেক্ষার পর আমরা দুইটি ট্যাক্সি পেলাম। বশীর ছেলেদের একটি ট্যাক্সিতে উঠতে বলল। ট্যাক্সি ছাড়ার পূর্বক্ষণে তাদেরকে বলল, যদি অপারেশনে সাকসেস না হতে পারো তবে তোমাদের অভিভাবকদেরকে কবরস্থানে পাঠাব। তারা তোমাদের লাশ সেখানেই পাবে। এটা হচ্ছে যাত্রার পূর্বক্ষণে সর্বশেষ সতর্কবাণী। সীমান্ত পাড়ি দেয়ার পূর্বক্ষণে এমন সতর্কবাণী আমরাও পেয়েছি। তারপর আমি আরেকটি ট্যাক্সি নিয়ে মোগল মহল রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম। আমার দুই নম্বর সাথী ঠিক আটটায় এ রেস্টুরেন্টে আমার সাথে দেখা করে বলল, চার তরুণীই সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছে। ছেলেরা আসার পর চারটি রিজারভেশন কার্ড ছেলেদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছি। আর বাকি নয়শত করে টাকা প্রত্যেক তরুণীকে দিয়েছি। তারপর তাদেরকে দু'গ্রুপে ভাগ করে দুইটি ট্যাক্সিতে বসিয়ে আকবর ও অশোকা হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার বিবরণ শুনে তাকে তার হোটেলে চলে যেতে বললাম। আমিও চলে এলাম।

* * *

লুধি একটি ফোর-স্টার হোটেল। ৩১শে ডিসেম্বরের আনন্দের হাওয়া তাদের গায়ে পৌঁছেছে। যার ফলে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এ রাতের অনুষ্ঠানের আয়োজনে। অনুষ্ঠান সাজানো হচ্ছে হোটেলের কনফারেন্স হলে। হলকে বাহারী রঙের বাতি দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, গেটের লাইটগুলো তাদের আলো দিয়ে দর্শনার্থীদের স্বাগতম জানাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাতিয়ে তুলার জন্য বোম্বে থেকে আনা হয়েছে নামী দামী শিল্পীগোষ্ঠী। মোটকথা আনন্দের কলরবে মুখরিত লুধি হোটেল। আমার টেবিল পূর্ব থেকে বুক করা ছিল। তাই আমি গোসল সেরে ফ্রেশ হলাম। তারপর ড্রেস চেঞ্জ করে আমার টেবিলে এসে বসে গেলাম। এতক্ষণে অন্য দর্শনার্থীরাও জোড়ায় জোড়ায় এসে প্রত্যেকের টেবিলে বসে গেল। এক সময় হল দর্শনার্থী দ্বারা কানায় কানায় ভরে

গেল। এখন হলে আর কোন টেবিল খালি নেই। প্রত্যেক টেবিলেই জোড়ায় জোড়ায় দর্শনার্থী বসা। শুধুমাত্র আমার টেবিল ছাড়া। আমার টেবিলে দুটি চেয়ার। একটিতে আমি বসেছি। আমার সাথে কেউ না থাকায় অপর চেয়ারটি খালি পড়ে আছে। এ সকল অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের জোড়া ছাড়া এককভাবে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। আমি তাদের রেগুলার কাস্টমার হওয়ায় আমার জন্য এ ছাড় দেয়া হয়েছে। তদুপরি আমার টেবিলও নারী থেকে বেশিক্ষণ খালি থাকতে পারল না। সবেমাত্র অনুষ্ঠানে আমার প্রিয় ও প্রসিদ্ধ পশ্চিমা নাচ Rock-N-Roll ও Shake দিয়ে শুরু হয়েছে এমন সময় ড্যান্স হলের ম্যানেজার আমার কাছে এলো এবং ভদ্রভাবে বিনয়ের সাথে কানে কানে বলল, স্যার! একজন ব্রিগেডিয়ার তার স্ত্রীকে নিয়ে কোন টেবিল রিজার্ভ করা ছাড়াই হঠাৎ হলে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ব্রিগেডিয়ার আমাদের বহু পুরনো ও ভাল কাস্টমার। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে তাদেরকে আপনার টেবিলে বসিয়ে দিই? আমি যেহেতু অনেক আগে থেকেই একাকীত্বের কারণে অতীষ্ট হয়ে উঠেছিলাম তাই কালবিলম্ব না করে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। তাই প্রথানুযায়ী তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য হলের দরজায় গেলাম। ম্যানেজার ব্রিগেডিয়ার ও তার স্ত্রীর সাথে আমায় পরিচয় করিয়ে দিল। মধ্যবয়সী স্বামী ও যুবতী স্ত্রী। আমি তাদেরকে আমার টেবিলে আসার জন্য আহ্বান করলাম। তারা তো আমার আহ্বানের অপেক্ষায়ই ছিল। ফলে আমার আহ্বান পাওয়া মাত্র এক গাল হাসি দিয়ে আমার সাথে টেবিলের দিকে আসতে শুরু করলো। টেবিলের এক পাশের চেয়ারে ব্রিগেডিয়ারের স্ত্রী ও অপর পাশের চেয়ারে ব্রিগেডিয়ার নিজে বসলো। আর আমি বসলাম তাদের মাঝে। এবার আমি ব্রিগেডিয়ার ও তার স্ত্রীকে কিছু পান করার অফার দিলাম। জবাবে ব্রিগেডিয়ার বলল, Thank you very much but we will pay dutch. অফার করায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে এ পানীয়ের বিল আমি পরিশোধ করবো। এ শর্তে পান করতে পারি। আমি সম্মতি প্রকাশ করলাম। ব্রিগেডিয়ার বেলায়েতী ও হুইস্কির অর্ডার দিল। তারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বোতলের পর বোতল পান করে শেষ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল।

নববর্ষের রাতে বাহারী রঙের লাইটের আলো, বাদ্যযন্ত্রের মনমাতানো সুর-ঝংকার, নর্তকীদের শরীরের মোহনীয় অঙ্গভঙ্গি দর্শকদের মাতিয়ে

তুলল। এহেন মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ারের স্ত্রী ব্রিগেডিয়ারকে ফ্লোরে আসার জন্য কয়েকবার চোখে ইশারা করল। এদিকে ব্রিগেডিয়ার মদে তার বেটারী ফুল চার্জ করতে পারে নাই। যার কারণে স্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারল না। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। অবস্থাদৃষ্টে আমি ব্রিগেডিয়ারের সহযোগিতায় হাত বাড়াতে চাইলাম। তাই ব্রিগেডিয়ারকে বললাম, আপনি অনুমতি দিলে আপনার স্ত্রীর সাথে নাচতে পারি। অনুমতি নিয়ে তার স্ত্রীকে আমার সাথে নাচার জন্য দাওয়াত দিলাম। আমার দাওয়াত তো না যেন আবেহায়াত। সে যেন নবযৌবন ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল এবং নৃত্যের জন্য ফ্লোরে নেমে এল। আমরা নৃত্য শুরু করলাম। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাত পৌনে বারটা পর্যন্ত নাচলাম। ব্রিগেডিয়ার স্ত্রীর চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় নিজের উপর নিজেই রাগ করে এমন বেশি মদ পান করলো যে এখন নিজেকে কন্ট্রোল করা তার দায় হয়ে গেল। ফলে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেল। এতেই খুঁজে পেল তার প্রশান্তি। এদিকে ফটোগ্রাফাররা হলে ঘুরে ঘুরে সকলের ছবি তুলছে। বারটা বাজার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, এমতাবস্থায় আমি ব্রিগেডিয়ারকে জাগিয়ে বললাম যে, বারটা বাজার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। আপনার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে নববর্ষকে বরণ করুন। তারপর আমি হোটেলের বাইরে চলে এলাম। লুধি হোটেল আকবর ও অশোকা হোটেল থেকে বেশি দূর না হওয়া সত্ত্বেও প্রবল আগ্রহ আমাকে হোটেলের বাইরে নিয়ে এল। ঠিক বারোটা বাজে ছোট ছোট ধামাকার আওয়াজ শুনা গেল। এমন সময় হোটেলের সমস্ত আলো এক মিনিটের জন্য নিভিয়ে দেয়া হল। তারপর আমার বুকের ধড়ফড়ানি প্রতি নিয়ত বৃদ্ধি পেতে লাগল। অপর দিকে নানাবিধ আশঙ্কা মনের মাঝে দোলা দিতে লাগলো যে, বারটা তো বেজে গেল। হোটেলের লাইটগুলো নিভে গেল। তথাপি আমার ছেলেদের ধামাকার আওয়াজ কেন শুনতে পাচ্ছি না? এভাবে জল্পনা-কল্পনা করে বরফের মত কনকনে শীতে শুধুমাত্র ড্রেস কোট পরেই বিশ মিনিট কাটিয়ে দিলাম। তারপরও যখন কিছুতে কিছু হল না আর ঠাণ্ডাও সহ্য করার মত নয় তখন মনস্থ করলাম, হোটেলে ফিরে যাব। ঠিক তখন এম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আকবর ও অশোকা হোটেলের দিকে যেতে দেখলাম। এম্বুলেন্সের যাত্রা দেখে আমি আনন্দে আটখানা হয়ে গেলাম এবং ঠাণ্ডার কথা বেমালুম

ভুলেই গেলাম। হারিয়ে গেলাম কল্পনার জগতে। দুই নয়নে দেখতে লাগলাম যে, ধামাকায় আতংকিত হয়ে দর্শকবৃন্দ ও হোটেলের স্টাফরা এলো পাতাড়ি দৌড়ে পালাচ্ছে। কর্ণকুহরে অনুরণিত হল ধামাকায় আহতদের বুকফাটা আর্তচিৎকার– বাঁচাও বাঁচাও! পরক্ষণেই যখন আমি সম্বিত ফিরে পেলাম তখন কালবিলম্ব না করে হোটেলে ফিরে এলাম।

* * *

পরদিন দুপুর বারটায় আমি নাজির ও আরিফ বশীরের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি বশীরের টেবিলে পড়ে আছে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা। তাই উৎসুক নেত্রে পড়তে লাগলাম পত্রিকা। পত্রিকার হেড লাইনে বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে গতকাল রাত বারটায় আকবর ও অশোকা হোটেলে বোমা ফাটার সংবাদ। তাছাড়া পত্রিকা জুড়েই রয়েছে বোমার আঘাতে দর্শকদের আহত হওয়ার সংবাদ। এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যক্তিদের মতামত আরো অনেক কিছু। এবার বশীর নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, চার ছেলেই সকাল দশটায় আমার কাছে এসেছিল এবং ধামাকার বিবরণ বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে, যথা সময়েই বোমাগুলো ফাটিয়েছে। বোমা ফাটার সাথে সাথেই হলের মধ্যে শুরু হয়ে যায় দৌড়ে পালানোর প্রতিযোগিতা। অন্ধকারে যে যেদিকে পেরেছে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। তার সাথে শুনা যায় বোমার আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া বোতল ও গ্লাসের ঝন ঝন শব্দ ও আহতদের ভয়ার্ত চিৎকার। নারীদের বুকফাটা কান্না। এ হট্টগোলের মাঝেই ছেলেরা হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ছেলেরা এও বলেছে যে, দিল্লীর কূটনৈতিক পাড়ায় নির্মিত হোটেলে ধামাকা হওয়ার কারণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উভয় হোটেলকে কর্ডন করে ফেলেছে। তারপর চালানো হয়েছে চিরুনি অভিযান। কিন্তু এ অভিযানেও কোন দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার না হওয়ায় পরিশেষে সেনা বাহিনী কর্ডন উঠিয়ে নিয়েছে। এই বিবরণ শুনার পর আজকের মত বশীরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যার যার ঠিকানায় চলে এলাম।

দুই দিন পর পুনরায় আবার আমরা বশীরের গ্যারেজে গেলাম। বশীর তার ছেলেদের সফলতায় খুশিতে আত্মহারা। আমরা তার আনন্দকে ধরে রাখার জন্য তাকে মুবারকবাদ দিলাম। সেও আমাদেরকে মুবারকবাদ দিল। তারপর আমি বশীরকে বললাম, এই ধামাকা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের প্রথম ধাপ ও তোমার ছেলেদের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যেহেতু

তোমার ছেলেরা সফল হয়েছে সেহেতু এখন আমরা এই ছেলেদের দ্বারা এমন কাজ করাব যাতে সারা ভারতে তুলপাড় শুরু হয়ে যাবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সেই কাজের প্ল্যান তোমাকে দিব। তুমি সে অনুযায়ী ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিবে। তারপর বহু রিকোয়েস্ট করে ছেলেদের পুরস্কারস্বরূপ বার হাজার টাকা বশীরকে দিলাম এবং তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমি সাথীদের সাথে পরামর্শ করে ২৬শে জানুয়ারির জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করলাম। তারপর এ প্রোগ্রামকে সুবিন্যস্তভাবে সাজালাম। ২৬শে জানুয়ারি ভারতের বড় বড় শহরে বিশেষ করে দিল্লীতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্যারেড এয়ার শো এবং অস্ত্র প্রদর্শনী হয়। আর এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে বিদেশী রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, দেশীয় সর্বস্তরের বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ থেকে নিয়ে আপামর জনসাধারণ পর্যন্ত। এতগুলো লোক অন্য কোন অনুষ্ঠানে সমবেত হয় না। যার দরুন এ দিনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এদিনে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়ার জন্য অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

তারপর সাথীদের সাথে পরামর্শ করে দিল্লীর পালম এয়ারপোর্ট, বোম্বাইয়ের শান্তা করোড এয়ারপোর্ট এবং শ্রীনগর বিমান বন্দরের কার্গো সেকশনকে ধামাকা চালানোর জন্য নির্বাচন করলাম। সাথে সাথে এও ঠিক করলাম যে, দিল্লীতে প্যারেড চলাকালে নিজেদের তৈরি মালুটুফ বোম ফাটাব। বোমের ধরন সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, এয়ারপোর্টের কার্গো সেকশনে ধামাকার জন্য নির্ধারিত বোমে অগ্নি বিচ্ছুরণকারী পদার্থ বেশি ব্যবহার করতে হবে। তাহলে শারীরিক ক্ষতির তুলনায় আর্থিক ক্ষতি বেশি হবে। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হল। বোম কিসে তৈরি করা হবে? যদি বোতলে তৈরি করা হয় তবে এই বোতল নিয়ে অপারেশন স্থলে যাওয়ার পূর্বেই গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা প্রবল। এজন্য যে বর্তমানে শীতকাল। আর শীতকালে মানুষ বোতল নিয়ে যায় না। তাই যুগোপযোগী বস্তু নির্বাচন করা হল চায়ের ফ্লাক্সকে। শীতকালে প্রত্যেক দর্শনার্থীই গরম চা ভর্তি ফ্লাক্স নিয়ে সমাবেশ স্থলে যাবে। এদের সাথে আমাদের চার পাঁচটা ফ্লাক্সও অনায়াসে নেয়া যাবে। এতে ধরা পড়ার আশংকা খুবই কম। এভাবেই পূর্ণ করলাম অপারেশনের

দিন, স্থান ও সাইজ। তারপর সাথীদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বশীরের গ্যারেজে গেলাম। তাকে আমাদের প্লান বিস্তারিত বললাম। আমাদের প্লানে সেও একমত হল। তাকে বললাম, আতশী গ্রেনেড আমি আমার সিনিয়রের প্রদানকৃত দিল্লীর নতুন সহযোগী থেকেই সংগ্রহ করতে পারব। তুমি শুধুমাত্র চার পাঁচটি ফ্লাস্কে তার ও ব্যাটারির সাহায্যে বোম তৈরি করবে। এয়ারপোর্টে ধামাকার ব্যাপারে সে বলল, প্রথম অপারেশনকারী ছেলেদের মধ্য থেকে তিনজনকে এ কাজের জন্য পাঠাব। এ তিনজনের একজন কয়েকবার বোম্বাই গিয়েছে। বোম্বাইয়ের রাস্তাঘাট তার পরিচিত। তাই তাকে বোম্বাই পাঠাব। দিল্লীর পালাম বিমান বন্দর তো সবাই চিনে। এখানে কাজ করা কোন ব্যাপারই না। সমস্যা হলো শুধুমাত্র শ্রীনগর বিমান বন্দরে কাজ করা। '৭১ সালের যুদ্ধের পর সরকার ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। শীতকাল হওয়ার কারণে জনসাধারণের আসা যাওয়া কমে গেছে। এমতাবস্থায় মিশন যদি সফল হয় তখন সমস্যা হবে শ্রীনগর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে। কেননা শ্রীনগর থেকে বের হওয়ার মাত্র দুটি পথ খোলা। একটি বিমান পথ অপরটি রাজপথ। উভয় পথেই চেক পোস্ট রয়েছে। আর চেকিং-এর সময় যদি চেককারীদের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দেয়া যায় তখন সেনা বাহিনী গ্রেফতার করে ফেলবে। এ সকল আশংকার কারণে আমাদের অপারেশনের তালিকা থেকে শ্রীনগরের বিমান বন্দর বাদ পড়ে গেল। এরপর আমরা আমাদের আলোচনার সমাপ্তি টেনে সেদিনের মত বৈঠক শেষ করলাম।

পরদিন আমি আমার নতুন সহযোগীর কাছে গেলাম। তার ফ্যাক্টরী দিল্লীর সন্নিকটে শিল্পনগরীতে অবস্থিত। গিয়ে দেখি সে কাজে ব্যস্ত। কাজ থেকে অবসর হওয়ার অপেক্ষায় ফ্যাক্টরির ওয়েটিংরুমে বসে রইলাম। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর সে কাজ থেকে ফারেগ হল। তখন আমি তার সাথে ফ্যাক্টরির অফিসে সাক্ষাত করলাম। সাক্ষাতের পূর্বেই আমি আমার কোড নম্বর একটি চিরকুটে লিখে রেখেছিলাম। সেই চিরকুট তার টেবিলে রেখে দিলাম। হঠাৎ এই প্রথম সাক্ষাতে সে চিরকুট ভালভাবে না দেখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল। তার চাউনি দেখে আমি বুঝতে পারলাম, সে আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছে। তাই তার জবাব দেয়ার জন্য বললাম যে, এই চিরকুটটি ভালভাবে পড়ুন তবেই আমার পরিচয় পেয়ে যাবেন।

এবার সে ভালভাবে চিরকুটটি পড়ে চমকে উঠল এবং আমার কোড নম্বর আবার জিজ্ঞেস করল। আমিও তার কোড নম্বর জিজ্ঞাসা করলাম। উভয়ে উভয়ের কোড নম্বর যাচাইয়ের পর একে অপরের প্রতি নিশ্চিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং আমাকে তার বুকে জড়িয়ে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? জবাবে আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! ভাল আছি। সে বলল, চলুন, আমরা অফিস থেকে বের হয়ে যাই। বাকী কথা গাড়িতে বসেই সারব। আমিও তার সাথে একমত হয়ে বললাম, চলুন।

আমরা উভয়েই অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠলাম। সে দিল্লীর পথে ধীরগতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করল, ভাই বলুন, এ অধম কি খেদমত করতে পারে? প্রতি উত্তরে আমি বললাম, আমার এমন ছয় পিস গ্রেনেড দরকার যার পিন খোলার পনের মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে। (সাধারণ গ্রেনেড পিন খোলার ৬ মিনিট পর ফোটে।) সে বলল, এমন গ্রেনেড তো বর্তমানে রেডি নেই। তবে আমি আপনাকে টাইম বোম দিতে পারব, যার ফোটার সময় আমরা নিজেরাই সেট করে থাকি। এগুলো আপনাকে আগামী সোমবারে দিব। আপনি আগামী সোমবারে আজ যে সময়ে এসেছেন ঠিক এ সময়ে আমার ফ্যাক্টরির পাঁচশ' গজ দূরের মেইন রোডে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি সেখানেই আপনার সাথে সাক্ষাত করব। তারপর গাড়িতেই আপনার কাঙ্ক্ষিত বস্তু একটি ব্রিফকেসে ভরে দিয়ে দিব। আমার ফ্যাক্টরিতে শতকরা ৮০ জন কর্মীই অমুসলিম। তাই আপনি ফ্যাক্টরিতে না আসলেই ভাল হবে। এই নিন আমার বাসা ও ফ্যাক্টরির ফোন নাম্বার। যদি কোন প্রয়োজন হয় তবে কষ্ট করে আর আসতে হবে না। বরং এই নাম্বারে ফোন করে শুধু এতটুকু বলবেন যে, 'আজ পরিবেশ শান্ত'। তবেই আমি আপনাকে চিনতে পারব। আপনি আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় এয়ারপোর্ট রোডের পানির ট্যাংকির কাছে থাকবেন, আমি সেখান থেকেই আপনাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিব। আপনাকে তো টাকা পয়সাও দিতে বলা হয়েছে। আমি সোমবারে ব্রিফকেসে বোমের সাথে এক লাখ টাকাও দিব। এভাবে কথা বলতে বলতে যখন আমরা দিল্লীর কাছাকাছি চলে এলাম তখন দিল্লীর নিকটবর্তী এক বাস স্টেশনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

আমার অভ্যাস হচ্ছে, কারও সাক্ষাতের স্থান যদি না চিনি তবে সাক্ষাতের পূর্বেই খুঁজে খুঁজে সে স্থান চিনে নিই। সাক্ষাতের সময় স্থান

খুঁজতে গিয়ে যেন সময় নষ্ট না হয়। তাই অভ্যাস মত ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে এয়ারপোর্ট রোডে যেতে বললাম। ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞেস করল, এয়ারপোর্ট রোডে কোথায় যাবেন? আমি তাকে বললাম, পানির ট্যাঙ্কির কাছে। ড্রাইভার আমাকে পানির ট্যাঙ্কির কাছেই নামিয়ে দিল। আমি ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। ড্রাইভার চলে গেল। এবার আমি পায়ে হেঁটে পানির ট্যাঙ্কির নিকটবর্তী বাসার ধারে গেলাম। বাসার গেইটে নেমপ্লেটে মালিকের নাম পড়ে জানলাম যে, এটা চলচ্চিত্র জগতের প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা শামআকের মালিক ইউনুস দেহলভীর বাসা। আমি আরও কিছুদূর গিয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে হোটেলে চলে এলাম।

আমাদের পক্ষ থেকে ২৬শে জানুয়ারিকে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণে নিয়োজিত হলাম। এর মধ্যে আমরা পাকিস্তান থেকে দুইবার ডাক পেয়েছি, আমরাও আমাদের ডাক পাকিস্তান পাঠিয়েছি। আর যশোবন্ত নিয়মিতভাবে ডাকের প্যাকেট আমার সাথীদের কাছে প্রদান করছে এবং এর বিনিময়ে প্রত্যেকবার দুই হাজার করে টাকা নিচ্ছে। পাকিস্তান থেকেও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। প্রত্যেকটা কাজই রুটিন মাফিক হচ্ছে। আমার কথামত বশীরও ছয়টি ফ্লাক্স কিনে তার খোলের ভিতর বোম ফিট করে ফেলেছে এবং ছেলে চারজনকেই জানিয়ে দিয়েছে তাদের মিশন। আমি পূর্ব নির্ধারিত তারিখ হিসেবে সোমবারে আমার নতুন সহযোগীর নিকট থেকে ছয়টি টাইম বোম এবং এক লাখ টাকা এনেছি। আমি এবং আমার সাথীরা যদিও সশরীরে ২৬শে জানুয়ারির মিশনে অংশগ্রহণ করছি না তথাপিও যুদ্ধের দিনের মত সাথীদের ঘর অপারেশন রুম-এ পরিণত হয়েছে। ওই রুমে সকলের সাথে পরামর্শ করে সব কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমি প্রত্যেক দিন বশীরের গ্যারেজে যেতে লাগলাম আর ছেলেরাও আসতে লাগল। আমি তাদের অপারেশনের সময় যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সেই সকল সমস্যা ও তার প্রতিকারের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলাম। ছেলেরাও আমার কথা মত সন্তুষ্টচিত্তে বীরত্বের সাথে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে। তাদের এ সুনিপুণ কর্মদক্ষতা প্রমাণ করছে, তারা যথাযথভাবে তাদের মিশন সফল করতে পারবে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে আমি তাদেরকে দুটি টাইম বোম এনে দিলাম এবং তা

বারবার অপারেট করা প্র্যাকটিস করালাম। তারপর তাদেরকে টাইম বোম ২০ মিনিট পর ফাটার জন্য সময় এডজাস্ট করার পদ্ধতি অনুশীলন করিয়ে বললাম, টাইম বোম কার্গো সেকশনে কার্গোর বড় কার্টুনে লুকিয়ে রাখবে। ছেলেরা বলল, স্যার! কার্গো সেকশনে কিভাবে প্রবেশ করবো? বললাম, এই সেকশনে অধিকাংশ এজেন্ট তাদের পণ্য বুক করতে বা খালাস করতে এসে থাকে। তোমরাও তাদের সাথে তাদের সঙ্গী হিসেবে প্রবেশ করবে। তারপর শরীর খারাপের ভান করে কোন বড় কার্টুনে বসে পড়বে এবং বোমভর্তি ছোট থলে সাবধানে সুইচ অন করে পিছনের কার্টুনে রেখে দিবে। তারপর দ্রুতগতিতে সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে। বিশ মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্ট এরিয়া ত্যাগ করতে না পারলেও কার্গো সেকশন ছেড়ে টার্মিনালে পৌঁছতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে দূরে চলে যাবে।

আরিফ তাদেরকে পালম এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল এবং প্র্যাকটিক্যালি কার্গো সেকশনের পরিবেশ দেখিয়ে আনলো। তাছাড়া আরিফ কার্গো সেকশনের কর্মীকে জিজ্ঞেস করে, বুকিংয়ের কতদিন পর কার্গো বোম্বেতে এসে পৌঁছে, আরও অনেক তথ্য জেনে ফিরে এল।

বোম্বের ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, দুইজন ছেলে সেখানে যাবে। একজন অপারেশন চালাবে আর অপরজন তাকে কভার করবে। বশীর তাদেরকে ৪টি পিস্তল দিবে। বিপদের আশংকা হলে ফাঁকা গুলি ছুঁড়বে। আর সশস্ত্র কোন লোক সামনে দাঁড়ালে তাকে গুলি করে সেখান থেকে পলায়ন করবে।

প্লান মোতাবেক ২১শে জানুয়ারি দু'টি ছেলে ট্রেনযোগে বোম্বের উদ্দেশে রওনা হল। বশীর তাদেরকে একটি অ্যাড্রেস দিয়ে বলল, প্রয়োজন সাপেক্ষে এরা শুধু তোমাদের সাহায্যই করবে না বরং সেখানে তোমরা আত্মগোপনও করতে পারবে। বশীর ফোনে এই কন্ট্রাক্টকে বলে দিল, এই নামের কোন ছেলে তোমাদের কাছে আসলে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করো। বশীর, আরিফ, নাজিরও ছেলেদের কর্মতৎপরতায় বুঝতে পারলাম, তারা প্রত্যেকেই এই কাজকে তাদের ব্যক্তিগত কাজ মনে করে তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করছে। ছেলেরা বোম্বাই চলে যাওয়ার পর আমি বশীরের সাথে মিলে মালুটুফ বোম তৈরি করলাম। এখানে বোম তৈরির পদ্ধতি এজন্য উল্লেখ করছি না যে, উল্লেখ করলে পরে প্রতিটি বাড়ি বোম

তৈরির ফেক্টরিতে পরিণত হবে। বশীর এ কাজের জন্য চারটি ছেলেকে নির্বাচন করেছে। আমি তাদেরকে এ বোম অ্যাকটিভ করা এবং নিক্ষেপ করানো বিশ বারের মতো রিহার্সেল করালাম।

২৫শে জানুয়ারিতে পালম এয়ারপোর্ট ও পেরেডগামী ছেলেরা পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে। তাই আমরা আমাদের দায়িত্ব বণ্টন করলাম। আমি ও আমার সাথীরা প্যারেডে যাব। আমার দুই নম্বর সাথী মিশন চলাকালে ছবি তুলবে। আর অন্য এক সাথী তাকে কভার দিবে। অপর দুই সাথীর দায়িত্ব হচ্ছে অপারেশন পরিচালনাকারী চার ছেলেকে কভার দেয়া। আরিফের দায়িত্ব হচ্ছে ছেলেদের পালম এয়ারপোর্টের কার্গো সেকশনের অভ্যন্তরে পৌঁছানো। ২৬শে জানুয়ারিতে অপারেশনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৮টা ৩০ মিনিটে দিল্লীর প্যারেড গ্রাউন্ডে আর এগারটায় উভয় এয়ারপোর্টে। এ নির্দিষ্ট সময়ে পরিবর্তন শুধুমাত্র অপারেশন স্থানের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হতে পারে অন্যথায় নয়। বোম্বাইগামী ছেলেরা ফোনে আরিফকে জানিয়েছে, তারা নিরাপদে বোম্বে পৌঁছেছে এবং শান্তা কবোজ এয়ারপোর্টের কার্গো সেকশনে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে।

এটাই আমাদের প্রথম মিশন যাতে আমরা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক আর সমস্ত মিশন পরিচালনার দায়িত্ব ছেলেদের কাঁধে। আমার খুব ভাল করেই মনে আছে যে, ২৫ এবং ২৬শে জানুয়ারির রাত আমি খুবই বিচলিতভাবে কাটিয়েছি। সারা রাত আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুআই করেছি যে, পূর্বের মিশনের মত আমাদের এ মিশনও সফল কর। বিশেষভাবে এ মিশনে অংশগ্রহণকারী ছেলেদের সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ রাখ। আমরা তো পাকিস্তান থেকেই মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে এসেছি। পক্ষান্তরে এ ছেলেরা শুধুমাত্র আমাদের অনুপ্রেরণায় এ বিপজ্জনক কাজে অংশগ্রহণ করছে।

২৬শে জানুয়ারি আমি প্রত্যুষে উঠে তৈরি হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। সকাল ৮টায় ইন্দিরা গান্ধীকে লাল কেল্লায় ভারতের পতাকা উড়াতে হবে এবং সাড়ে ৮টায় প্যারেড শুরু হবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। হালকা হালকা বৃষ্টিও পড়ছে। অনেক কষ্টে একটি ট্যাক্সি পেলাম। তবে ট্যাক্সি ড্রাইভার মিটারের পরিবর্তে কন্ট্রাকে যেতে সম্মত হল এবং প্যারেডের গেইট থেকে সামান্য দূরে নামিয়ে দিল। প্যারেডের জন্য ভারতের তিন বাহিনীর সৈন্যদল ও ট্যাংক তোপ, মিজাইল, বেইরেজ,

মোবাইল রেডারের ট্রাক, সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী বিএসএফ দল, উট আরোহী মরু যুদ্ধের যোদ্ধা দল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সামরিক পুল তৈরির মোবাইল ট্রাক সারিবদ্ধভাবে প্যারেডের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরে রয়েছে প্যারা মিলিটারী ফোর্স, পুলিশ এবং সিএমএইচ-এর নার্সদের দল। তাদের পর স্কাউটদের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রুপ পিটি প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। সর্বশেষ বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বকারী ফ্লুট রয়েছে। প্যারেড দেখার জন্য প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রদূত এবং ভিআইপি ব্যক্তিদের জন্য গার্ড অব অনার প্রদর্শনের চবুতরার উভয় পাশে সামিয়ানা টানানো হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানকে গার্ড অব অনার গ্রহণ করতে হবে। এ সময় তিন বাহিনীর প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী চবুতরায় বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্যারেডের মাঠে প্যারেড দেখার জন্য সাধারণ জনগণের বিপুল সমাগম হয়েছে। দর্শকদের জন্য রক্ষিত চেয়ারের সারি ডিঙ্গিয়ে মেইন রোডের অনেকদূর পর্যন্ত কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মাঠের উভয় পাশে দর্শকদের বয়ে আনা ছাতা আর ছাতাই নজরে পড়ছে। এই মাঠের চারদিকে ভারতের সৈন্য ও পুলিশের জওয়ানরা সিকিউরিটির জন্য জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা এত বিশাল প্যারেড যে রাজকীয় সংবর্ধনার চবুতরা থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার পূর্বে চত্বরের ডান পাশের সড়কেও এক কিলোমিটার পর্যন্ত প্যারেডে অংশগ্রহণকারীরা একদম তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ছেলেদের পূর্বেই বুঝিয়ে দিয়েছি, যখন প্যারেড শুরু হওয়ার ঘোষণা হয়ে যাবে তারপরই তোমরা কাজ করবে। কেননা ঘোষণার অর্থ এই যে, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর প্রধান ছাড়াও সমস্ত রাষ্ট্রদূত এবং ভিভিআইপি ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত হয়েছেন। এ কারণেই আমি অপারেশনের সময় নির্ধারণ করা সত্ত্বেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদেরকে দিয়েছি।

আমরা যে মালটুফ বোম তৈরি করেছি এটা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ফ্লুটসে অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করা এবং বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করা। ২৬শে জানুয়ারি সাধারণ সরকারী ছুটি একান্ত সার্ভিস ছাড়া যেমন হাসপাতাল ফায়ার ব্রিগেড এয়ারপোর্ট ও রেলওয়ে ইত্যাদির ছুটি নেই। আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করেছি। এখন সমস্ত কাজ ছেলেদেরই করতে হবে। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাদেরকে সহযোগিতা

করবেন। একথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করছি না যে, আমি এদিন ঘাবড়িয়ে গেলাম। আমরা ভারতে যে অপারেশনই পরিচালনা করেছি তা গোপনে আন্ডার শেডোতে করেছি। প্রকাশ্যে লাখ লাখ জনসাধারণের মাঝে নামেমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের দ্বারা ধামাকা করার অভিজ্ঞতা এটাই প্রথম। ভারতের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা রক্ষীদের লক্ষ্য হল একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী। তার পরবর্তী অংশগ্রহণকারী প্যারেড দলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই কম, আর ফুলুটুদের উপর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো নামমাত্র– এক-দু'জন পুলিশ দেখা যাচ্ছে। আমার এখানে কোন কাজ নেই। তাছাড়া আমি তো পূর্ব থেকে ডিএমআই-এর নজরে পড়ে গেছি। ফলে শুভ ফলের কামনা বুকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ধামাকার সময় হোটেলে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে।

আমি আমার সাথী ও বশীরের সাথে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, ধামাকার পর পরই তারা তাদের ঠিকানায় চলে যাবে। ছেলেরা বশীরকে তাদের মিশনের রিপোর্ট জানাবে। আমি বিকাল তিনটায় সাথীদের ঘরে যাব এবং নাজিরের ফোন থেকে বশীরের সাথে যোগাযোগ করব। বশীরের ও আমার ঐ দুই সাথীর যারা ছেলেদের কভার দিয়েছে তাদের রিপোর্টের সাথে তুলনা করব। দিল্লীর পালম এয়ারপোর্টের রিপোর্টও এরই মাঝে এসে যেতে পারে। আর এটাও হতে পারে যে, বোম্বাই থেকেও রিপোর্ট এসে পৌঁছবে।

আমি বিকাল তিনটায় সাথীদের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশে হোটেল থেকে বের হয়ে একটি ট্যাক্সি নিলাম। আমি যাব নতুন দিল্লী থেকে পুরাতন দিল্লীতে। পথে কয়েকটি সিগন্যাল পড়লে। একটি সিগন্যালে যখন গাড়ি থামল তখন পত্রিকার হকারদের চিৎকার করে বুলেটিন বিক্রি করতে দেখলাম। হকারদের কাছে শুধুমাত্র একটি ইংরেজি বুলেটিন পেলাম। আর বাদবাকি সবই হিন্দী ভাষায় লেখা। বুলেটিনের হেড লাইনে লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'প্যারেডে অংশগ্রহণকারী চার ফুলুটুর উপর ধামাকা। এ ধামাকায় প্যারেডে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং উপস্থিত বিশজন ফুলুটু সদস্য আহত হয়েছে। অন্য আরেকটি কলামে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে, পালম এয়ারপোর্টের কার্গো সেকশনে বোম ধামাকা হয়েছে। এ ধামাকায় কার্গোর অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে ও ছাদের একাংশ ধসে পড়েছে। বুলেটিনে এও লেখা হয়েছে যে, উভয় স্থানেরই ঘটনাস্থলে কাউকে

গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ কার্গো সেকশনকে ঘিরে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ফুলুটুদের উপর ধামাকার কারণে জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়াদৌড়ির সময় পদতলে পিষ্ট হয়ে কয়েকজন আহতও হয়েছে। আমি যে সংবাদ জানার জন্য সাথীদের কাছে যাচ্ছিলাম তার বেশিরভাগই বুলেটিনে পেয়ে গেলাম।

আমি কার্গো সেকশনে ধামাকাকারী ছেলেদের কঠিনভাবে বলে দিয়েছিলাম, বোম অন করে কার্টুনের মাঝে ফিকে মারবে। আর এভাবে নিক্ষেপ করার কারণে বোমের কাযক্ষমতা কিছুটা কমে যায়। ৩৬০ ডিগ্রীর বৃত্তে ১৮০ ডিগ্রী ক্ষমতা তো ফ্লোরেই শেষ হয়ে যায়। আর বাকি ১৮০ ডিগ্রীর মধ্যে আনুমানিক ১৪০ ডিগ্রী বোমের তীব্রতা উভয় দিকের কার্টনকে ধ্বংস করে দেয় এবং আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর শুধুমাত্র ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রী ধামাকার তীব্রতা সোজা উপরে যায়। যার কারণে কয়েকটি কার্টন ধ্বংস হয়ে তাতে আগুন ধরে যায় এবং ছাদের একাংশ ধসে পড়ে ফ্লোরে গর্ত হয়ে যায়। মোটকথা, এতে কেউ নিহত হয়নি। ফ্লোটসের উপর যেহেতু মালুটুফ বোম ছোঁড়া হয়েছে সেহেতু ফ্লাক্সের খোলের স্প্লিন্টারে সেখানে উপস্থিত লোকজন আহত হয়েছে। আর ফ্লোট যে কাঠের ফ্রেমে তৈরি করা হয়েছে তাতে তখনই আগুন ধরে গেছে। দিল্লীতে আমাদের এম্বিশন শতভাগ সফল হয়েছে। প্যারেড চলাকালে ফোলুটুদের উপর ধামাকার আগুন লাগা এবং জনগণ আহত হওয়ার কারণে ফুলুটোরা প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং ভিভিআইপিগণ প্যারেডে আগুন লাগা ও এ আগুনে জনগণ আহত হওয়া এবং ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। জনসাধারণের এলোপাতাড়ি দৌড় ধামাকার প্রভাবকে কয়েকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। পালম এয়ারপোর্টের ধামাকা Restricted Zone এ ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে বহু মানুষ হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু দুটি কারণে আমরা তা করিনি। একে তো ভারতের নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত এ গণহত্যায় সকলের সহযোগিতা নিহতদের এবং ভারত সরকারের সঙ্গী হত। পক্ষান্ত রে বর্তমানে পরিস্থিতি এই যে, সকলেই ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার উপর নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, যা ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে।

সাথীদের ঘরে গিয়ে আমি নাজিরের মাধ্যমে আরিফকে ডাকালাম। তার আসার পূর্বে আমি সাথীদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানলাম। আমরা যে মালুটুফ বোম তৈরি করেছিলাম তা সাধারণ মালুটুফ বোমের চেয়ে বহু আপগ্রেড ছিল। আমার সাথীরাও এ বোমের কর্মক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছে। তারা জানাল, ছেলেরা একে একে চারটি ফ্লাক্সই ফুলুটুতে ছুঁড়ে মেরেছে। বোম বিকট শব্দে ফেটেছে। বোমের স্প্লিন্টারে শুধুমাত্র ফুলুটুতে দাঁড়ানো লোকেরাই আহত হয়নি বরং তার চারদিকে দাঁড়ানো প্যারেড দর্শকরাও আহত হয়েছে। বোম ফোটার সাথে সাথেই ফুলুটুতে আগুন ধরে গেছে। সেখানে দণ্ডায়মান লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করেছে। এ দৌড়াদৌড়ির মাঝে ছেলেরাও সরে পড়েছে। বশীর পূর্ব থেকেই তাদের জন্য গাড়ি রেডি রেখেছিল। যার ফলে তারা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে গেছে। এরপর আরিফ নাজিরের ঘরে এসে পৌঁছল। আমি দু'তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম এবং এ মহান কাজের জন্য উভয়কেই মুবারকবাদ জানালাম। তারাও আমাদের সবাইকেই মুবারকবাদ জানাল।

তারপর আমি আরিফের কাছে জানতে চাইলাম, কার্গো সেকশনে কাজ করতে কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা? জবাবে আরিফ বলল, এয়ারপোর্টে কাজ করতে কোন সমস্যাই হয়নি। বরং আরামের সাথেই কাজ করা হয়েছে। তখন কার্গো সেকশনের হলে মাত্র দুইজন লোক ছিল। ছেলেরা কার্টন দেখামাত্রই বোম অন করে সেই কার্টনে এমনভাবে জেঁকে বসে যেনো কারও অপেক্ষায় বসে আছে। সুযোগ বুঝে বোমের থলে সন্তর্পণে দুইটি কার্টনের মাঝে রেখে দেয়। এরপর কার্গো সেকশনের লোকেরা এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, কেন এসেছেন। জবাবে ছেলেদের একজন তাদের বলল, আমাকে একজন বেয়ারিং এজেন্ট সকাল এগারটায় এখানে সাক্ষাৎ করতে বলেছিল। আমি অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করলাম, এখনও সে এলো না। বাইরে আমার বিশেষ কাজ রয়েছে। যদি কেউ আমার কথা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তবে বলবেন যে, চন্দর এসেছিল। অপেক্ষা করে চলে গেছে। এই বলে সে বাইরে চলে এসেছে। এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়িতে আমি তাদের অপেক্ষা করছিলাম। তারা মাত্র গাড়িতে বসেছে। এমন সময় বিকট শব্দে ধামাকার আওয়াজ শোনা গেল। আমাদের কাজ যেহেতু শেষ সেহেতু আমরা ফিরে এলাম। গাড়ি বশীর

ভাই পাঠিয়েছিল। আমি পথে নেমে গেছি আর গাড়ি ছেলেদের নিয়ে বশীর ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

এতক্ষণে আমি বোম্বাই বিমান বন্দর ছাড়া বাকি সমস্ত তথ্যই পেয়ে গেছি। নাজিরের টেলিফোন থেকে বশীরের সাথে যোগাযোগ করার পর বশীর বলল, এখন পর্যন্ত বোম্বাই থেকে কোন সংবাদ আসেনি। কেননা তখনও ডাইরেক্ট ডায়ালিং-এর সিস্টেম চালু হয় নাই। সুতরাং যোগাযোগে অনেক সময়ের প্রয়োজন। ছেলেদের দিল্লীর অপারেশন সফল হওয়ায় আমি বশীরকে ও তার ছেলেদেরকে মুবারকবাদ জানালাম। অপারেশনের সফলতায় বশীর খুশিতে আটখানা হয়ে পরদিন দুপুরে আমাদেরকে তার বাসায় খানার দাওয়াত দিল। জবাবে আমরা তাকে বললাম, দাওয়াত দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমরা দাওয়াত গ্রহণ করতে পারছি না। তার কারণ এই যে, এই ধামাকার পর অবশ্যই দিল্লীর সিকিউরিটি কঠোর হয়েছে। এ কঠোর নিরাপত্তায় কোনভাবেই সতর্কহীন কাজ করতে চাই না। তারপর আমি বশীরকে বললাম যে, বোম্বাই থেকে যদি কোন সংবাদ পান তবে তা সংক্ষেপে আরিফকে জানিয়ে দিবেন। আমার মন বলছে, দিল্লীতে মুসলমান এবং শিখদের টেলিফোনে হয়তো বা অবজারবেশন লেগে গেছে। আমি নাজিরের ঘরে চা পান করে সাথীদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন আমি কামরাতে বসে আছি। এ সময় আমার দুই নম্বর সাথী আমাকে ফোন করল। আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কোডে সে আমাকে বলল, 'চায়ের দুই পেডী ছিঁড়া-ফাড়া ব্যতীতই গুদামে পৌঁছেছে।' এ কথার অর্থ এই যে বোম্বাই গমনকারী ছেলেদ্বয় নিজেদের কাজ সেরে নিরাপদে বোম্বাইয়ের ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। এ ফোনের কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকেও চিন্তামুক্ত হলাম। কামরাতেই নাস্তা আনালাম এবং নির্ধারিত দুইটি পত্রিকা ট্রিবিউন এবং টাইমস অব ইন্ডিয়া দেখতে শুরু করলাম। উভয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার হেড লাইনে ছবিসহ লেখা হয়েছে, প্যারেড চলাকালে এবং দিল্লী ও বোম্বাই এয়ারপোর্টে ধামাকার লোমহর্ষক সংবাদ। ট্রিবিউন পত্রিকায় তো পরিষ্কার করেই লেখেছে, ২৬শে জানুয়ারিতে দিল্লী ও বোম্বাইয়ের ধামাকা পাকিস্তানের এজেন্ট বা স্বাধীনতাকামী শিখেরা করেছে। আর টাইমস অব ইন্ডিয়াতে শানদার প্যারেডকে Symbol of negligence সাব্যস্ত করে বলেছে যে, এমন প্রদর্শনীয় প্যারেডের স্থলে

আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করা দরকার। শত্রু আমাদের এত কাছাকাছি চলে এসেছে এবং দুঃসাহসের সাথে তাদের কাজ করেছে যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। প্যারেড চলাকালে এ ট্র্যাজেডি এবং দিল্লী ও বোম্বাই বিমান বন্দরে ধামাকা মূলত আমাদের মুখে শত্রুর থাপ্পড় বই আর কিছু নয়। এখনও পর্যন্ত ৩১শে ডিসেম্বরের থাপ্পড়ের ব্যথা কমেনি। এরই মধ্যে ২৬শে জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার আরেক থাপ্পড় আমাদের খেতে হল। একমাত্র আমাদের অসাবধানতার কারণে। যত পত্রিকায় এ ধামাকার সংবাদ ছেপেছে যথাসম্ভব সমস্ত পত্রিকা সংগ্রহ করলাম ডাকের সাথে পাকিস্তান পাঠানোর জন্য। এ ধামাকার সংবাদ বিবিসিও প্রচার করেছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রদূতেরাই এ ধামাকার সংবাদ তাদের দেশে পাঠিয়েছে।

আমরা পাকিস্তান থেকে এ ধামাকার কোন নির্দেশনা পাইনি। এ ধামাকা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে করেছি। সম্ভবত আমার সিনিয়রের কানে এ ধামাকার সংবাদ পৌঁছেছে। তবে তারা জানে না যে এ অপারেশন কারা করেছে। আমাদের ডাকযোগে যখন তারা জানতে পারবে যে, এ অপারেশন আমরা করেছি আর আমাদের সঙ্গ দিয়েছে পাকিস্তানের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ একদল যুবক। আমি নিশ্চিত যে, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। আর বাস্তবেও তাই হয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রেরিত ডাকে তারা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে পরিচালিত অপারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ কাজের জন্য আমাদের মুবারকবাদ জানান।

এ ধামাকার পর বাস্তবিকই গোয়েন্দা বিভাগ চৌকান্না হয়ে গেছে। যার কারণে আমরাও আমাদের ডাক পাকিস্তানে আদান-প্রদান করা ছাড়া সামনের সকল প্রোগ্রাম সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিয়েছি। যথারীতি যশোবন্ত থেকে ডাক গ্রহণ করছি। এদিকে একের পর এক কর্মসূচী অব্যাহত থাকার কারণে আমরা মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এ ক্লান্তি দূর করার জন্য আমি আমার সিনিয়রের নিকট থেকে সকলের জন্য দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করালাম।

ছুটির প্রোগ্রাম এভাবে সাজালাম যে, প্রথমে আমি একা দশ দিন ছুটি কাটাব। তারপর বাকী সাথীরা দুই দুইজন করে পালাক্রমে ছুটি কাটাবে। আমি ছুটির দশদিন শিমলায় কাটাতে চাইলাম। শীতকালে বরফে ঢাকা

শিমলা প্রত্যেক পর্যটকেরই প্রিয় স্থান। আর এ নয়নাভিরাম অনেক হৃদয়গ্রাহী ঘটনাই আমরা শুনেছি আমার আব্বা আম্মার নিকট থেকে। তাছাড়া আমার জন্মের পর থেকে নিয়ে আমার পাঁচ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তারা শিমলাতেই কাটিয়েছেন। যার কারণে শিমলার বৈচিত্রময় স্মৃতি আমার হৃদয়ের ক্যানভাসে অস্পষ্টভাবে আঁকা আছে। এখন আমি সশরীরে গিয়ে সেই স্মৃতিগুলো দুই নয়নে দেখে স্পষ্ট করতে চাই যেন তা স্মৃতির পর্দায় স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। আমি সাথীদের বললাম, আমি শিমলা পৌঁছে তোমাদের ফোন করবো এবং যোগাযোগ করার জন্য আমার ফোন নম্বর বলে দিব। তবে ইমার্জেন্সি সময়ে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবা।

এদিকে পাকিস্তান থেকে প্রেরিত ডাক গ্রহণ ও আমাদের ডাক প্রেরণের তারিখ আমার ছুটিকালীন সময়ে পড়েছে। এজন্য আমি আমার দুই নম্বর সাথীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার সময় কুরিয়ারের সাথে সাক্ষাতের স্থান ও কোড নাম্বার বলে দিলাম। আগন্তুক কুরিয়ার ইতোপূর্বে ক্যাপ্টেন আরশাদের সাথে এসে আমার দুই নম্বর সাথীকে দেখেছে। সফরের জন্য আমার পক্ষ থেকে সর্বোতভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তাই কয়েক জোড়া কাপড় ব্রিফকেসে ভরলাম এবং সাইলেন্সার বিশিষ্ট পিস্তল সাথে নিলাম। তারপর হোটেল থেকে চেক আউট করলাম। লকারে রক্ষিত এক লাখেরও বেশি টাকা দুই নম্বর সাথীর হাতে অর্পণ করে বাকি সামানা সাথীদের কাছে রেখে ২০শে ফেব্রুয়ারিতে শিমলার উদ্দেশে রওনা হলাম।

শিমলায় পৌঁছে সবেমাত্র ৬দিন কাটিয়েছি এমন সময় আমার দুই নম্বর সাথী ফোন করল। ফোনে সে বলল, নাজির ও আরিফের মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছি যে, বশীরকে কে যেন গুলি করে হত্যা করেছে। এ সংবাদ শোনামাত্রই আমার ভ্রমণের মুড একেবারে মাটি হয়ে গেল। আমি দুই নম্বর সাথীকে বললাম, তুমি এবং বাকি সাথী কেউ কখনও ঐ দিকে যেয়ো না। নাজির ও আরিফকেও নিষেধ করো ঐদিকে যেতে। আমি প্রথম গাড়িতে ফিরে আসছি।

ভ্রমণকালে সর্বদা আমি এ কথাই ভাবছিলাম যে বশীরকে কে হত্যা করল? পুলিশ অথবা সরকারী লোক যদি তাকে হত্যা করত তবে পত্রিকায় বাড়িয়ে চড়িয়ে তার হত্যার দাবি করা হতো। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা একদম নীরব।

এ জল্পনা-কল্পনার অবসান দিল্লী পৌঁছার পরই সম্ভব। বশীরের মত মুখলেছ সাথীর মৃত্যু আমার জন্য কম দুঃখের নয়। দিল্লী পৌঁছার পর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রথমে সাথীদের ঘরে গেলাম। যথাসম্ভব তাদের থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে নাজির এবং আরিফের সাথে একটি মিটিং করলাম।

এ ঘটনা সম্পর্কে নাজির ও আরিফ যা জানতো তারা তা আমার কাছে বলল। কিন্তু তার পরও চিহ্নিত করতে সক্ষম হচ্ছিলাম না যে হত্যাকারী কে? আরিফ আমাকে বলল, বশীর রাতে খাবারের পর ভিতরের কামরায় একাকী বসে আছে। এমন সময় কেউ তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে যাকে সে তার কামরায় ডেকে নিয়েছে। বশীরের কর্মচারীর ভাষ্যমতে সাক্ষাতপ্রার্থী একজন শিখ ছিল। কর্মচারী চা তৈরি করার জন্য পাক ঘরে গেলে গুলির আওয়াজ শুনে। তখন সে দৌড়ে কামরায় এসে দেখে যে বশীরের মাথায় গুলি লেগেছে। আর সে বিছানায় সটান হয়ে পড়ে আছে। শিখ গুলি করে উধাও হয়ে গেছে। কর্মচারী বশীরের পরিচিতজনদের মধ্য হতে দুই একজনকে জানালে পরে তারা এসে পুলিশকে এ ঘটনার খবর জানায়। পরদিন সকালে লাশ পোস্টমর্টেম হয় এবং দুপুরের পর লাশ দাফন করা হয়। আরিফ এও বলল যে, বশীর যদিও লাওয়ারিশ কিন্তু তার জানাযায় হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। একে দুঃখের পাহাড় চেপে বসেছে মাথার উপর। অপরদিকে বশীরের মৃত্যুকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমার মাথায় ঘুরে ফিরে শুধুমাত্র একটি কথাই পাক খেতে থাকে যে, বশীর তো এমন মানুষ যে দিনের বেলাও না জেনে না বুঝে কারও সাথে সাক্ষাত করে না। আর সে কিভাবে রাতের বেলা অপরিচিত একজন লোককে সাক্ষাত করার জন্য তার ভেতরের কামরায় ডেকে নিয়ে কর্মচারীকে চা তৈরির অর্ডার করতে পারে?

বশীরের সেই কর্মচারীর নাম আকেল মিঞা। এ ঘটনা সম্পর্কে তার ভাষ্য এই যে, সেও ঐ শিখকে চিনে না। সে আরও বলল, আমি যখন আগন্তুকের সংবাদ নিয়ে বশীরের নিকট গেলাম বশীর তখনই শিখকে তার নিকট নিয়ে যেতে বলল। আকেল মিঞা দুই বছর যাবত বশীরের এখানে বাবুর্চির কাজ করছে। এ ঘটনার হিসাব মিলাতে আমার দুইদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তথাপিও হিসাব মিলাতে পারলাম না। এমন সময় কল্পনার আকাশে বুদ্ধির সূর্য উদিত হল। যে ঘটনা সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র আকেল মিঞার বর্ণনার আলোকে চিন্তা ভাবনা করছি। যদি আকেলের

বর্ণনা মিথ্যা হয় তবে এমতাবস্থায় আমার কাছে সব হিসাব কেন যেন একে একে মিলে যেতে লাগল যে, বশীর তো তার জীবনের অর্জিত সকল টাকা তার কাছেই রাখতো। আর এ টাকার খবর হয়তো আকেল মিঞাও জেনে থাকবে। আকেল মিঞা আনুমানিক দুই বছর আগে তার কাছে এসেছে। এই দুই বছরের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনদিন আকেল মিঞা এই শিখকে দেখে নাই। এটা বড় আশ্চর্যের কথা। আকেল মিঞার কথা মত সে মিরাঠের অধিবাসী। যা কোন দিন যাচাই করা হয়নি। এ সকল কথার আলোকে আমার মন আকেলকেই একমাত্র হত্যাকারী চিহ্নিত করছে। এ ঘটনার পর টাকা নিয়ে ভেগে না যাওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, বশীরের বন্ধু জানবাজ সাথীরা তাকে পাতাল থেকেও খুঁজে বের করবে। তখন সে ধরা খেয়ে যাবে। আমি আরিফ ও নাজিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, বশীরের কাছে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে? জবাবে তারা বলল যে, শুধুমাত্র তিন হাজার টাকা পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে বশীরের নিজের মুখের কথাই যে তার কাছে নয় দশ লাখ টাকা আছে। যা সে তার ঘরেই রেখেছে। আমি যতই আকেলের ব্যাপারে ভাবতে লাগলাম ততই আমার সন্দেহ ঘনীভূত হতে লাগল। পরিশেষে আমি সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, আগামীকাল সন্ধ্যায় আমরা সশস্ত্র হয়ে বশীরের গ্যারেজে যাব।

সন্ধ্যাবেলা ট্যাক্সিতে করে আমরা বশীরের গ্যারেজের উদ্দেশে রওনা হলাম। বশীরের গ্যারেজের কিছু দূরেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। আমরা সিগন্যাল ফাইল পজিশনে সামনে এগুতে লাগলাম। কেননা পরিস্থিতি এমন রূপ নিয়েছে যে আমাদের খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হচ্ছে। বশীর আমাদের একজন বিশ্বস্ত সাথী। তার মাধ্যমেই আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ও ২৬শে জানুয়ারিতে মিশন সফল করেছি। যার কারণে তার খুনের বদলা নেয়া আমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে।

এ ব্রাহ্মণ্যবাদে বশীরের অতীব প্রয়োজন। তার মাধ্যমেই আমরা তরুণ ছেলেদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে আমার সিনিয়রের অনুমতিও নিয়েছি। এখন বশীরের ঘাতক যদি ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারে যে বশীরের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে তবে যে কোন সময় সে আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই নিজেদের হেফাজতের জন্য ও পথের কাঁটা দূর করার জন্য বশীরের

ঘাতককে খুঁজে বের করা ও বশীরের রক্তের বদলা নেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

আমরা বশীরের গ্যারেজের কাছাকাছি চলে গেলাম। এমন সময় চারটি ছেলে আমাদের দেখে দূর থেকে হাতের ইশারায় সেদিকে যেতে নিষেধ করল। এরা তো ঐ ছেলে যারা ২৬শে জানুয়ারিতে প্যারেড চলাকালে ধামাকা করেছিল। তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল বিধায় আমরা পিছু হটতে লাগলাম। ছেলেরা দ্রুত হেঁটে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করল এবং আমাদের কানে কানে বলল, গ্যারেজে এখন পুলিশ আছে। কথা বলতে বলতে আমরা একটা ছাপরা হোটেলের কাছে চলে এলাম। দুটি ছেলে আমাদের সেই ছাপরা হোটেলের পিছনে নিয়ে গেল। সেই হোটেলের রন্ধনশালার সাথেই একটি কামরা রয়েছে এবং এতে কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল রয়েছে। ছেলেরা আমাদের এ কামরায় বসাল। তারপর বলল, এই ছাপরা হোটেল বশীরই একজন বেকার মুসলমানকে নিজের টাকা ব্যয় করে তৈরি করে দিয়েছে। এ হোটেল বশীরের সাথীদের জন্য নিরাপদ জায়গা। এ কথোপকথনের মাঝেই গরম চা চলে এল। আমরা কথা বলছি আর চা পান করছি এমন সময় শুনতে পেলাম আকাশের গর্জন। এখন বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যে কোন সময় বৃষ্টি হতে পারে। ছেলেরা বলল, পুলিশ আকেল মিঞার কাছে সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বশীরের মৃত্যুতে পুলিশ আনন্দিত হয়েছে। কেননা এ এলাকার একজন প্রাণপুরুষ ও দুঃসাহসী মুসলমানের মৃত্যু হয়েছে যে কিনা তাদের আতঙ্ক ছিল। তার মৃত্যুতে তাদের মাথা ব্যথা দূর হয়েছে। এজন্য শুধুমাত্র প্রথা পালন করা হচ্ছে। আমি ছেলেদের বললাম, আমরা আজ এ প্রতিজ্ঞা করে বের হয়েছি যে, বশীরের ঘাতককে চিহ্নিত করে তবেই ঘরে ফিরব। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনার কাকে সন্দেহ হয়? জবাবে আমি বললাম, আকেলের প্রতি আমার সন্দেহ হয়। ছেলেরা বিনাবাক্য ব্যয়ে আমার কথায় সায় দিল ঠিক তবে তারা চিন্তিত যে, এই দুই বছরের পুরোনো কর্মচারীর কি প্রয়োজন ছিল বশীরকে হত্যা করার। বশীর তো বেতন ছাড়া এমনিতেই বখশিস হিসেবেও অনেক টাকা-পয়সা দিত। আমি ছেলেদের বললাম, তোমরা আমাদের সাথে থাক। আজই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আকেল মিঞা দোষী না নির্দোষ। এতে ছেলেরা সম্মত হল। আমি দুটি ছেলেকে ডিউটি দিলাম, তোমরা গ্যারেজের নিকট কোথাও লুকিয়ে দেখ

পুলিশ গ্যারেজ থেকে বের হয়ে গেল কি না। পুলিশ গ্যারেজ থেকে বের হওয়ামাত্রই একজন আমাদের খবর দিবে আর আরেকজন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। আকেল যদি আমাদের পৌঁছার পূর্বে গ্যারেজ ছেড়ে কোথাও যায় তবে তার পিছু নিবে। ছেলে দুটি চলে গেল। আমরা তাদের সংবাদের অপেক্ষায় সেই কামরাতেই বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরই একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে বলল, পুলিশ বের হয়ে গেছে। আকেল মিঞা গ্যারেজের গেট লাগাতে চাইছিল। আমার সাথী গেট লাগানোর পূর্বেই তাকে কথায় মশগুল করে রেখেছে। আপনারা যদি দ্রুত সেখানে যান তবে গ্যারেজে প্রবেশ করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। আমরা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম এবং বিদ্যুৎগতিতে গ্যারেজে পৌঁছলাম। গ্যারেজের মেইন গেট আবজানো ছিল। আমরা একজন একজন করে গ্যারেজে প্রবেশ করলাম এবং আমাদের সর্বশেষ প্রবেশকারী সাথী গ্যারেজের গেট ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

আকেল মিঞা হঠাৎ করে আমাদের নয়জনকে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই গেট বন্ধ হতে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে যাবে এমন সময় আমার কারাতে কুংফু দক্ষ সাথী তার চেহারায় একাধারে দুই তিনটি ঘুষি মেরে তাকে অর্ধ বেহুঁশ করে ফেলল। আমি দুইজন ছেলেকে গেটে ডিউটি দিলাম। বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তবে তারা যেন আমাদের খবর দিতে পারে। আমার দুই সাথী ও দুই ছেলে মিলে আকেলের হাত পা ধরে ব্যাংদোলা করে উঠিয়ে তাকে গ্যারেজের ভিতরের ঐ কামরায় নিয়ে গেল বশীর যেখানে দিনের বেলা বসত। ঐ কামরার ভিতরে আরেকটি কামরার পর বশীরের থাকার দু'টি রুম আছে। আর সেই কামরার সাথেই রয়েছে ঐ বড় কামরা যেখানে লেদ মেশিন ছাড়া আরও অন্য মেশিন আছে। বশীরের থাকার রুম তালা লাগানো। আকেলের পকেট থেকে আমার দুই নম্বর সাথী চাবি বের করল। তারপর আকেলকে হেচড়াতে হেচড়াতে আমরা সকলে বশীরের থাকার রুমে চলে এলাম। এ কামরাতেই বশীরকে হত্যা করা হয়েছে।

আকেলের জন্য এমন আচরণ ছিল অপ্রত্যাশিত। ধীরে ধীরে তার অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগল। সে কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই আমি সাথীদের ইঙ্গিত করলাম সাথে সাথেই তারা তাকে ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করা শুরু করে দিল। আমার ইচ্ছা হল, শুরুতেই তাকে এমন প্রহার করব যাতে

করে সে সত্য বলতে বাধ্য হয়। যখন তাকে উত্তম মধ্যম দেয়া শেষ হল তখন আমি তাকে বসতে বললাম। সে বহু কষ্টে উঠল এবং চেয়ারে বসতে যাবে এমন সময় আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, ফ্লোরে নতজানু হয়ে বস। এরপর আকেল ফ্লোরেই বসল। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন ঠিক করে বল যে, বশীর কিভাবে নিহত হয়েছে। জবাবে সে শিখের পুরনো কাহিনী বলতে শুরু করলো। তখন আমার সাথী পিছন থেকে তার মাথায় একটি ঘুষি লাগাল। আমি আকেলকে বললাম যে, আমি তোকে সত্য বলতে বলেছি। তুই কিনা পুরনো কাহিনী বলতে শুরু করেছিস। যা সবই মিথ্যা। তুই সত্য বল। এবার আকেল অকপটে শপথ করে বলতে লাগল যে শিখের ঘটনাই সত্য। এরপর আমার সাথীরা তাকে পুনরায় মারতে শুরু করে দিল।

তখন বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাছাড়া আমরা যে কামরায় আছি এ কামরা গ্যারেজের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। যার কারণে আকেলের আর্ত চিৎকারের আওয়াজ রাস্তায় পৌঁছার সম্ভাবনা নেই। আমার এক সাথী লোহার ভারী একটি রেঞ্জ উঠিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে বলল, হাত থেকে শুরু করব না পা থেকে? আমি বললাম, পা থেকে। আমার সাথী তাকে জুতা খুলতে বলল। আকেল জুতা খুলতে গড়িমসি শুরু করল। আমার সাথীরা তাকে মজবুত করে ঝাপটে ধরে তার জুতা খুলে ফেলল। দুইজন আকেলকে শক্ত করে ধরল। একজন মুখে রুমাল চেপে ধরল। রেঞ্জধারী সাথী শরীরের সমশক্তি ব্যয়ে তার পায়ে রেঞ্জ মারা শুরু করল এবং যখন তার হাড্ডি ভেঙ্গে ভুষি হয়ে গেল তখনই তাকে ছাড়ল। আকেল অনেক ছটফট করল তবে সে আমার সাথীদের বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারল না। আকেলের মুখে রুমাল ঠিক ঠাক মত চেপে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার সাথী তার দ্বিতীয় পা টেনে লম্বা করল এবং মারার জন্য রেঞ্জ উঠাল। আমি আকেলকে বললাম– এখন সত্য বল। তবে এ পা নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যাবে। অন্যথায় তোর দ্বিতীয় পা ও পর্যায়ক্রমে শরীরের প্রতিটি হাড্ডিকে বিশটি করে টুকরা করা হবে। তুই তো দেখেছিস যে আমরা সত্য বের করতে সবই করতে পারি। আকেলের মুখে রুমাল ঢুকানো রয়েছে এবং দুই বাহু আমার সাথীদের বাহু বন্ধনে আটকা রয়েছে। ফলে সে জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করতে শুরু করল। আমার এক সাথী তার মুখ থেকে রুমাল বের করার পর

আকেল প্রথমে ব্যথায় চিৎকার করতে লাগল। তখন আমার রেঞ্জধারী সাথী রেঞ্জ উঠিয়ে তার পায়ে মারতে যাবে এমন সময় আকেল চিৎকার করে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মারবেন না। আমি সব সত্য বলব। এই বলে সে বলতে শুরু করলো যে, বশীরকে যেদিন হত্যা করেছি তার আগের দিন আমি তাকে তার গোপন সেলফ খুলতে দেখেছি। এই সেলফ এই কামরাতেই মাটিতে এমনভাবে নির্মিত যে তার সামনের দিক উপরের দিকে। আনুমানিক ফ্লোরের ১৬ ইঞ্চি ভেতরে কামরায় বড় টাইলসের ফ্লোর। সেলফ বন্ধ করে তার উপরে টাইলস রেখে দেয়া হয়। আর বড় গালিচা দিয়ে সেই টাইলস ঢেকে দেয়া হয়। কামরাতে বড় একটি গালিচা বিছানো রয়েছে। সেলফের স্থলে সোফাসেট বসানো হয়েছে। এ সেলফে প্রচুর টাকা দেখে আমার মতলব খারাপ হয়ে যায়। আমার প্রতি বশীরের এমন বিশ্বাস যে, আত্মরক্ষার জন্য একটি পিস্তলও দিয়েছে। এই পিস্তল দিয়েই আমি তাকে নিশানা করেছি। তারপর বশীরের পকেট থেকে চাবি নিয়ে সেলফ খোলার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেলফ নম্বর দিয়ে লক থাকার কারণে ব্যর্থ হলাম।

আকেলের জবানবন্দি অনুসারে আমরা সোফা সরালাম। গালিচা গুটিয়ে টাইলস উঠালাম। তারপর আকেলের কাছে চাবি চাইলাম। আকেল বলল, চাবি লেদ মেশিনের কামরায় মেশিনের নিকটেই লুকিয়ে রেখেছি। একজন সাথী ঐ কামরায় গিয়ে চাবি নিয়ে এল। সেলফে চাবি ঢুকালাম ঠিকই সমস্যা হল লক নম্বরে। সেলফ এতই মজবুত যে পিস্তলের গুলিতেও তা খুলা সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিত যে বশীর এ লক নম্বর কোথাও না কোথাও অবশ্যই লিখে রেখেছে। আমি বশীরের কাগজের আলমারী দেখতে শুরু করলাম। দেখলাম আলমারীতে বিদ্যুৎ ও পানির বিলের কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। একটি ডায়েরির মত খাতা কাগজের নিচে পেলাম। এতে নাম, টেলিফোন নম্বর এবং আশ্চর্য ধরনের অ্যাড্রেস লেখা রয়েছে। যেমন ১৪০ কেজি বস্তু পূর্ব দিগন্তে পৌছাতে হবে। দক্ষিণ দিগন্তে ৬ কেজি বস্তুর মূল্য পাওয়া যাবে। আমি নোট করলাম যে এই ডায়েরির প্রতি পৃষ্ঠার উপরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর গাণিতিক সংখ্যা ৭৮৬ লেখা রয়েছে। শুধুমাত্র একটি পৃষ্ঠা এর ব্যতিক্রম। যার ডানদিকে প্রথমে ৮ তার পরে ৬ লেখা রয়েছে। আর বাম পাশের শুরুতে ৭ লেখা রয়েছে। আমি চিন্তিত এই জন্যে যে, এই পৃষ্ঠায় ৭৮৬ কে

পৃথক পৃথক করে এবং উলটপালট করে লেখার কারণ কি? এদিকে আমার সাথীরা সেলফের নম্বর মিলানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কোন কারণ ছাড়াই আমি তাদের সরিয়ে দিলাম এবং নম্বরের বোতামগুলোকে জিরোতে নিয়ে এলাম। তারপর প্রথমে ডান পাশের নম্বরের বোতামকে ৮ এর ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর বাম পাশের বোতামের ঘরকে ঘুরিয়ে ৭ এর ঘরে নিয়ে এলাম এবং মধ্যবর্তী বোতামকে ঘুরিয়ে ৬ নম্বরের ঘরে আনলাম। এরপর আল্লাহর নাম নিয়ে হেন্ডেল ঘুরালাম। এবার সেলফ খট করে খুলে গেল। সেলফ খুলার মধ্যে আমার কোন কারামতি নেই। সব একমাত্র বিসমিল্লাহর বরকত। আমি সাথীদের বললাম, সেলফ একদম খালি করে দাও। সাথীরা সেলফ খালি করার পর সেলফ থেকে এগার লাখ পাঁচ হাজার টাকা, বিভিন্ন ধরনের ৮টি পিস্তল ও অসংখ্য গুলি এবং একটি ডায়েরি পেলাম।

ডায়েরিতে তার দলের সমস্ত ছেলের ঠিকানা এবং কিছু টেলিফোন নম্বর লেখা রয়েছে। আমি ডায়েরিটা পকেটে রেখে দিলাম। এ সময় বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে গেইটে দাঁড়ানো ছেলেরাও ভেতরে চলে এসেছে। টাকা এবং কাগজপত্র সাথীরা বশীরেরই একটি ব্রিফকেসে রাখল। অস্ত্র ও গুলি একটি ব্যাগে ভরল। আকেল হাঁটু গেড়ে বসে ডাগর চোখে আমাদের সেলফ খোলা ও সেলফ থেকে লাখ লাখ টাকা বের করতে দেখে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। এখন এ আকেলই মাথাব্যথা। আমার চিরাচরিত অভ্যাস যে, আমি কাজের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আমার আব্বা-আম্মা তাদের অনুপস্থিতিতে বন্ধুদের ও সাথীদের সাথে পরামর্শ করতাম। কিন্তু কখনও এর ব্যতিক্রমও করতাম। যখন আমার মনে কোন সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে হতো তখন আমি প্রথমে সেই কাজ করতাম পরে বন্ধুদের বলতাম।

আমি ছেলেদের গাড়িতে ব্যবহৃত ত্রিপল আনতে বললাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা একটি কাটা পুরানো ত্রিপল নিয়ে এল। আমি তাদেরকে ত্রিপল ঠিক করে বিছাতে বললাম। কারও বুঝে আসছে না যে আমি কি করতে যাচ্ছি। সকলেই নীরবভাবে আমাকে দেখছে। তারপর আমি সাথীদেরকে বললাম, আকেলকে ত্রিপলের মাঝখানে বসিয়ে দেয়ার জন্য। আমার কথামত তারা আকেলকে উঠিয়ে ত্রিপলে নিয়ে বসাল। আমি কি করতে যাচ্ছি কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই আমি আমার

সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তল বের করে আকেলের বুকে একের পর এক করে তিনটি গুলি বিদ্ধ করলাম। আকেল একটি হেচকি দিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল। আকেল যেহেতু বশীরকে হত্যা করেছিল শুধুমাত্র টাকার লোভে পড়ে। এতে সে আমাদের থেকে আমাদের এক ঘনিষ্ঠ ও জানবাজ সাথীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন আকেলকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আমার সাথে আমার সাথী, ছেলেদের ও আরিফ নাজিরকে ভারতীয় পুলিশ এবং ডিএমআই-এর হাতে তুলে দেয়া। আমার সাথীরা প্রথমে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। এখন তারা একদম চুপ হয়ে গেছে। সকল ছেলেই আমাকে লালাজি বলত। এদের মধ্য থেকে একজন নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, এটাই আমাদের দাবি ছিল যে, আপনি যেন তাকে জীবিত ছেড়ে না দেন। তার মত গাদ্দার ও নিমকহারামের শেষ পরিণতি এটাই হওয়া উচিত ছিল। সে চুপ হওয়ামাত্র সকলেই তার কথায় একাত্মতা প্রকাশ করল। তারপর আরেকটি ছেলে বলল, যদি তার লাশ পাঁচ সাত টুকরা করে দেয়া হয় এবং তার চেহারাকে বিকৃত করে দেয়া হয় ও তার গলা শরীর থেকে পৃথক করে দেয়া হয় তবে ভাল হবে। আরেকজন বলল, লাশ গ্যারেজেরই কোথাও দাফন করে দেয়ার জন্য। এ মত তখনই আমি বাতিল করে দিলাম। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হল যে, চেহারাকে বিকৃত করে দেয়া হবে এবং তার গর্দান শরীর থেকে পৃথক করে দেয়া হবে। আর বাকি শরীরকে আটটি টুকরা করা হবে। এ টুকরাগুলোকে ত্রিপল টুকরা করে পৃথক পৃথকভাবে বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হবে। তারপর আকেলের সকল আসবাব পত্র জ্বালিয়ে দেয়া হবে। তার এমন কোন চিহ্নও রাখা যাবে না যা দ্বারা বুঝা যায় যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বরং এটা যেন বুঝা যায় যে, সে পালিয়ে গেছে। লাশ টুকরা করার দায়িত্ব আমি ছেলেদেরকে দিলাম। আমার সাথীদের একজন চা তৈরি করার জন্য পাকঘরে গেল। আমার জীবনে এবং ভারত বর্ষে এটাই আমার প্রথম হত্যা। যার কারণে আমি বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নই।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। রাতও আড়াইটা বেজে গেছে। ফলে পুরো এলাকায় সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে। ঠিক এ সময় আমি আরিফের কাছে ফোন করলাম। আমি সংক্ষেপে তাকে বললাম, আমরা নয় সদস্য বর্তমানে ছাত্তা লাল মিঞাতে বিশেষ কাজে এসেছি। রাত চারটায় একটি প্রাইভেট কার প্রয়োজন। যেভাবেই হোক আপনি নিজে ড্রাইভ করে

ঠিক রাত চারটায় এখানে উপস্থিত হবেন। আরিফ কোন প্রশ্ন করার পূর্বেই আমি ফোন রেখে দিলাম। ছেলেরা আধা ঘণ্টার মধ্যে লাশের টুকরাগুলো নয়টি পুটলিতে ভরেছে। এর মধ্যে আমার সাথী চা-বিস্কিট নিয়ে হাজির হল। আমরা সকলে চা পানে মশগুল হয়ে গেলাম।

রাত চারটার পূর্বেই আমরা গাড়ির হর্ন বাজার আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু পরেই আরিফ প্রতিবেশীর একটি গাড়ি নিয়ে স্বশরীরে উপস্থিত হল। আমি তাকে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বললাম। এ কথা বলার ফাঁকে ছেলেরা লাশের টুকরার সবক'টি পুটলা গাড়ির ডকে রেখে দিল। তারা বুদ্ধি করে গ্যারেজ থেকে প্রতি পুটলায় পাঁচটি করে ইটও উঠিয়ে রাখল। যেন ইটের ভারে পুটলাগুলো তাড়াতাড়ি পানিতে তলিয়ে যায়। পুটলা যেন গাড়ির ঝাকুনিতে পথে খুলে না যায় এজন্য রশি দিয়ে মজবুত করে বাঁধল। এবার আমি আরিফের কাছে জানতে চাইলাম যে, কোন পথে গেলে সহজে সমুদ্রে যাওয়া যাবে। আরিফ বলল, একটি রোড যা জোনার ডাউন স্ট্রীমে দশ বার মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের কূল দিয়ে চলে গেছে। পুটলাগুলো ওখানেই ফেলা উত্তম হবে। এবার আরিফ আমাকে বলল যে, ভাইজান! এই পুটলা ফেলার জন্য ভোর চারটাকে কেন নির্বাচন করলেন? জবাবে আমি বললাম, আমি এ সময়কে এইজন্য নির্বাচন করেছি যে এ সময় পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের নাইট গার্ডরা বাসায় চলে যায়। অপরদিকে সকালের ডিউটিওয়ালাও সকাল ছয়টার পূর্বে ডিউটির স্থানে পৌঁছে না। এ সময় শুধুমাত্র পল্লীগাঁয়ের গোয়ালাদেরকে পথে দেখা যায়। গাড়িতে আরিফের সাথে আমার এক সাথী ও তিন ছেলে বসল। চারজন যাওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, পুটলা ফেলতে যেন বিলম্ব না হয়।

গ্যারেজে আমি ছাড়া আমার তিন সাথী ও একটি ছেলে রয়ে গেলাম। আরিফ ফিরার পথে ছাত্তা লাল মিঞার নিকটে ছেলেদের নামিয়ে সাথীকে নিয়ে বাসায় চলে যাবে। আমি আরিফকে এও বলেছি যে পুটলা সমুদ্রে ফেলার পর গাড়ির ডক কিছু সময় বৃষ্টিতে খোলে রাখবে। ডকে যদি রক্তের ফোঁটা পড়ে থাকে তবে তা দূর হয়ে যাবে।

আমাদের সাথে রয়ে যাওয়া ছেলেটি বলল, দিল্লীর অনেক ট্যাক্সি মালিকই ছাত্তা লাল মিঞার অধিবাসী। তারা সকাল সাতটায় উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। তাই আপনাদেরকে এর আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমরা ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গ্যারেজের কামরা ও মেইন গেইটে

তালা লাগালাম। তারপর ব্রিফকেস ও অস্ত্র, গুলিভর্তি ব্যাগ নিয়ে আবছা আবছা অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লাম।

এখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বৃষ্টিতে ভিজেই আমরা দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এক চৌরাস্তায় এসে পথের ডান পাশের একটি গাছতলায় দাঁড়ালাম। যদি কেউ আমাদের দেখেও ফেলে তবে বুঝবে না যে, আমরা ছাত্তা লাল মিঞা থেকে এসেছি। এখানে আমাদেরকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আমরা দাঁড়ানোর ক্ষাণিক পরেই দিল্লীগামী একটি ট্রাক এলো। আমরা ট্রাককে থামালাম। শিখ ড্রাইভার আমাদের বলল, আমি সবজিমন্ডি যাব। ট্রাকে যেতে চাইলে আমাকে দশ টাকা দিতে হবে। এ শর্তে রাজি হলে তড়িঘড়ি ট্রাকের পিছে বসে যাও। আমরা এ ট্রাককে গনীমত মনে করে তাতে উঠে ত্রিপলের নীচে বসে গেলাম। আমরা সবজিমন্ডি পৌঁছে ট্রাক ছেড়ে দিলাম। তারপর আমরা রেল স্টেশনের হেড ওভার ব্রিজ পাড়ি দিয়ে অপর পাশে আসলাম। এ পাশে অনেক রিকশা ও ট্যাক্সি দাঁড়ানো পেলাম। এ ট্যাক্সির মধ্য হতে দুটি ট্যাক্সি আমরা ভাড়া করলাম। একটিতে ঐ ছেলেকে দুই শ’ টাকা দিয়ে তার বাসায় পাঠালাম। অপরটিতে করে আমি আমার তিন সাথীর সাথে তাদের বাসার দিকে যাত্রা করলাম। আমরা একে তো সারা রাত জেগেছি। তারপর আবার বৃষ্টিতে ভিজেছি। ফলে আমাদের নাস্তা তৈরির কোন হিম্মত হল না। তাই নাজির সাহেবের স্ত্রী জাগার পর আমরা তাকে আমাদের জন্য নাস্তা তৈরি করতে বললাম এবং নাজিরকেও উপরে ডেকে রাতের ঘটনা তাকে শোনালাম। এ ঘটনার পর সেও আমার সাথে একাত্মতা পোষণ করল।

আটটার মধ্যে আরিফ আমার সাথীকে নিয়ে ফিরে এসে বলল যে, আমরা ভালভাবেই আমাদের কাজ সম্পন্ন করেছি। এতে কোন প্রকার সমস্যা হয়নি। এরপর আমরা শঙ্কামুক্ত হলাম। দু’দিন পর আরিফ বশীরের শীর্ষদের ডেকে একটি মিটিং করল। কেননা আরিফের মধ্যেই নেতৃত্বের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। আমি সমস্ত টাকা আরিফ ও নাজিরের হাতে সঁপে দিলাম। যা তারা উভয়ে জয়েন্ট একাউন্ট খুলে ব্যাংকে রেখে দিয়েছে। এই টাকা থেকে বশীরের শীর্ষদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের জন্য ও অন্যান্য বৈধ জরুরি কাজে টাকা উঠানোর অনুমতি রয়েছে। বশীরের এমন কোন ওয়ারিস নেই যার কাছে আমরা এ টাকা তুলে দিতে পারি। তাই এ টাকা

ব্যয়ের উত্তম খাত আমরা তার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ যুবকদের পিছনে ব্যয় করা উত্তম মনে করলাম। আমরা বশীরের মহত্ত্বের পরিচয় তার মৃত্যুর পরে জানতে পেরেছি। মৃত্যুর পূর্বে সে অসিয়ত করে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে গেছে, 'আমার মরণের পর এই গ্যারেজ বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ছাত্তা লাল মিঞা এলাকার বিধবা নারী, অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষদের মাঝে বণ্টন করে দিব।' বশীরের অসিয়তকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি আরিফকে পরামর্শ দিলাম যে, আপনি গ্যারেজকে বশীরের সঞ্চিত টাকার মধ্য হতে বর্তমানের বাজার হিসাবে তিন লাখ টাকা দিয়ে খরিদ করেন। আরিফ আমার পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করল।

এভাবেই তৈরি হল বশীরের জানবাজ ছেলের জমায়েতস্থল ও ভবিষ্যত কর্মসংস্থান। বশীর যে সকল ছেলেকে মোটর মেকানিক্সের কাজ শিখিয়েছিল তারাই ওয়ার্কশপকে গুছিয়ে নিল। পক্ষান্তরে ছাত্তা লাল মিঞার অধিবাসীরা যখন দেখল যে বশীর গুণ্ডার আবরণে ঢাকা এমন এক সোনার মানুষ যার কোন তুলনা নেই, যিনি তার জীবনের কষ্টার্জিত সমুদয় টাকা এ অঞ্চলের দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তাই তারা এ মহামানবের প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল এবং তাকে ভালোবেসে বহু প্রাইভেট কার ও ট্যাক্সির মালিক এ গ্যারেজের রেগুলার গ্রাহক হয়ে গেল। অপর দিকে ছেলেদের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় গ্যারেজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। যার ফলে গ্যারেজের জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

গ্যারেজে দিনের বেলা চলে গাড়ি মেরামতের কাজ আর রাতে চলে ট্রেনিং ও ভবিষ্যত কর্মসূচীর পরিকল্পনা। এভাবেই সামনে অগ্রসর হল আমাদের মিশন। বশীরের গ্যারেজ থেকে পাওয়া অস্ত্রগুলো আমাদের অস্ত্রের সাথে মিলিয়ে নিলাম। ছেলেদের হাতে এজন্য তুলে দিলাম না যে, যদি তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে বোকামী করে বসে তবে এ বোকামীর মাশুল আমাদেরকে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে হবে।

আইবি হেড কোয়ার্টারে ধামাকা

শত্রুদেশে আমি ও আমার সাথীরা পূর্ব থেকেই কঠিন পরিস্থিতিতে কালাতিপাত করছিলাম। এর মধ্যে আবার বশীরের মৃত্যু আমাদেরকে এমন ধাক্কা দিয়েছে যা সামাল দিতে আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তখন আমাদের অবস্থা যা হয়েছে তার পরিমাপ ঐ ব্যক্তি করতে পারবে, যে ব্যক্তি বিমানে সফরকালে বিমান বন্দরে এসে আবার একেবারে শত মাইল নিচে চলে যাওয়া বা ঝড়ো হাওয়ার কবলে পড়ে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। শুধুমাত্র কয়েক মিনিটের জন্য এমন পরিস্থিতিতে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা যেমন হয়। আমরা ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ দশ মাস যাবত সেই পরিস্থিতির শিকার। বশীরের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর আমি সাথীদের পূর্ব ঘোষিত ছুটি কাটিয়ে সতেজ হয়ে আসতে বললাম। কিন্তু সাথীরা ছুটি কাটাতে অস্বীকৃতি জানালে আমি তাদের ডাক আদান-প্রদান করা ছাড়া বাকি সকল তৎপরতা পনের দিনের জন্য বন্ধ করতে বললাম। এতে তারা রাজি হল। তাদের মত আমিও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু তা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারি না। আনুমানিক প্রতিদিন আমি সাথীদের ঘরে যাই ও আরিফ নাজিরের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে চলছি। এর মধ্যে আমার সাথীদের অবস্থা যা দেখলাম তা হচ্ছে এই, তারা বেশিরভাগ সময়ই বিছানায় শুয়ে কাটায়। শুধু তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি, এই ক'দিনে আমার অবস্থাও এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাথীদের কাছে যাতায়াতে ও কথাবার্তায় যে কয় ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। তার বাইরে বাকি সময় কামরাতেই শুয়ে বসে কাটাই। আমি অনুভব করলাম, এই পরিস্থিতি যদি আরও দীর্ঘায়িত হয় তবে অলসতা ও আতংক আমাদের উপর এমনভাবে জেঁকে বসবে যার ফলে আমরা আমাদের মিশন পূরণে অযোগ্য হয়ে যাব। আমার খুব ভাল করেই মনে আছে যে, ১৯৬৫ সনের যুদ্ধের পর সীজ ফায়ার চলাকালে পাকিস্তানী ও ভারতীয় বাহিনী একে অপরের ফায়ারিং রেঞ্জের মোর্চায় ওঁৎ পেতে বসে থাকত। পাক বাহিনী মাঝ রাতের সময় সম্মিলিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবারের না'রা লাগাত আর ভারতীয় বাহিনী তখন বৃষ্টি বন্যায় গুলিবর্ষণ করতো।

ভারতীয় বাহিনী সকাল বেলা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য আলোকিত বদনা নিয়ে মোর্চা থেকে বের হত আর পাক বাহিনী এ বদনাকে টার্গেট করে দুই চারটা গুলি ছুঁড়ত। ব্যস, এতেই তাদের কাম সাবাড়। কোথায় তাদের প্রাকৃতিক ডাকের প্রয়োজনীয়তা, কোথায় তাদের বদনা! কোন কিছুরই খবর থাকত না। ভয়ে তারা সবকিছু ভুলে যেত। ফলে ভারতীয় বাহিনী একাধারে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত অবিরাম গুলি চালাত। পক্ষান্তরে পাক বাহিনী ভারতের এ দুর্বলতাকে প্রতিদিনের আনন্দময় খেলা বানিয়েছে। অপর দিকে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থা এমন হয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। পরিশেষে নিজেদের দম্ভ অহংকারকে মাটি করে সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠকে ঐ সেক্টরের ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পাকিস্তানী সেক্টর কমান্ডারের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করল যে, পাকিস্তানী বাহিনী রাতের আঁধারে আল্লাহু আকবারের না'রা লাগানো ও সকাল বেলা প্রাতঃ সারার বদনায় গুলি না করলে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কয়েকজন ভারতীয় সেনা আল্লাহু আকবারের ধ্বনি শুনে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করতে করতে ফায়ার করতে গিয়ে নয় মিটার ল্যান্ড এরিয়া অতিক্রম করে পাক বাহিনীর গুলির শিকার হয়েছে।

অলসতা দূর করতে দেহ-মন চাঙ্গা রাখতে দৌড়ঝাঁপ করা আমাদের জন্য আপনি ছেলেদের সংবাদ দিবেন, আজ সন্ধ্যা ছয়টায় গ্যারেজে উপস্থিত হতে। জরুরি এক মিটিং আছে। সন্ধ্যা ছয়টায় আরিফকে সাথে নিয়ে আমরা পাঁচজন গ্যারেজে পৌঁছলাম। আমাদের পৌঁছার পূর্বেই ছেলেরা এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি ছেলেদের বললাম, এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের জন্য উচিত নয়। বরং হিট এন্ড রান পলিসির আলোকে আমাদের টার্গেট ঠিক করতে হবে। আমার কথার সাথে ছেলেরা ঐকমত্য প্রকাশ করলো। ছেলেরা যেহেতু দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে ভালভাবে পরিচিত। তাই নয়জন ছেলেকে তিনজন করে তিন দলে ভাগ করলাম। আর প্রত্যেক দলের ইনচার্জ আমার সাথী হবে। দুই নম্বর সাথী ব্যতীত বাকি তিনজন সাথীকে এ দায়িত্ব অর্পণ করলাম। এবার আমার সাথীসহ ছেলেদের সতর্কবাণী হিসেবে বললাম, টার্গেট নির্বাচন করার সময় আমাদেরকে এদিকে খুব খেয়াল করতে হবে যে, আমাদের অপারেশনে যেন জনসাধারণের জানমালের ক্ষতি না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আতংক সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণের মাঝে শাসকদের

অযোগ্যতা ফুটিয়ে তোলা। তারা যে জনসাধারণের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ একথা জনগণের মনে বদ্ধমূল করা। টার্গেট নির্বাচনের পর তোমরা আমাকে টার্গেটের বিবরণ বিস্তারিতভাবে জানাবে। টার্গেট যদি সর্বদিক থেকে ফলপ্রসু মনে হয় তবে আমি টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ্ করব। তারপর আমি ছেলেদের তিন গ্রুপের নাম দিলাম যথাক্রমে A, B, C. এরপর ছেলেদের বললাম, আগামী পরশু সকাল নয়টায় A গ্রুপ কাশ্মীরী গেটে এবং B গ্রুপ গান্ধীর সমাধিস্থলে ও C গ্রুপ লালকেল্লার সামনে পৌঁছে যাবে। এখানে প্রত্যেক গ্রুপের ইনচার্জ সাথীও তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে এবং টার্গেট নির্বাচনে তোমাদের সঙ্গ দিবে। ছেলেরা সকলেই আনন্দচিত্তে এ প্রোগ্রামকে গ্রহণ করল। আমার সাথীরাও ছুটি শেষ করে মূল কাজে ফিরে এল এবং নতুন মিশনের জন্য মানসিকভাবে নিজেদের তৈরি করতে শুরু করল। এ টার্গেট নির্বাচনের পিছনে আমার একটি অভিসন্ধি রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই, আমার সাথীদের দিল্লীর প্রতিটি অলিগলির সাথে পরিচিত হয়ে যাওয়া। আর আমি তাদের তথ্যের আলোকে দিল্লীর মানচিত্রের ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্পটে নিশানা লাগাতে পারব। সেখানে এ জাতীয় অপারেশন চালানো সম্ভব। তাছাড়া ঐ সকল স্পর্শকাতর স্থান যা আজও আমার দৃষ্টিসীমায় আসেনি সে সম্পর্কে অবগত হতে পারব। এ তিন গ্রুপকে টার্গেট নির্বাচন করতে কমপক্ষে দশ বারটি স্পর্শকাতর স্থান খুঁজতে হবে। আর স্পর্শকাতর স্থান দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সামরিক এলাকা নয়; বরং পুলিশ, রিজার্ভ পুলিশ, আই,ভি, নেভী এবং এয়ার ফোর্সের সদর দফতর ছাড়াও পুলিশ লাইন সামরিক ও অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর ট্রান্সমিশন পুলও এর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে সর্বদা সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারায় থাকে। আমার উদ্দেশ্য তাদেরকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম।

নির্দিষ্ট সময়ে আমার সাথীরা ছেলেদের সাথে নির্ধারিত স্থানে সাক্ষাত করল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব টার্গেট সন্ধানে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা আটটায় আমি সাথীদের ঘরে যেতাম। আমরা সকলের সামনে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি মানচিত্র মেলে রাখতাম। আমার সাথীরা প্রত্যেকেই যার যার মানচিত্রে চিহ্ন লাগাত এবং এ চিহ্নের মাধ্যমে এলাকার বিস্তারিত বিবরণ আমাকে জানাত। আমি আমার মানচিত্রে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে তাদের তথ্যের সারাংশ লিখে নিতাম।

এভাবে আনুমানিক দশ দিনে আমার কাছে ভিন্ন ভিন্ন চৌদ্দটি স্পর্শকাতর জায়গার তথ্য ও নির্দেশ পৌঁছেছে। আমার সাথী ও ছেলেরা খুবই উদ্যমতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার নজরানা পেশ করেছে। আমি সেই চৌদ্দটি স্থানকে গুরুত্বের দিক থেকে সিরিয়াল ঠিক করলাম এবং তিনদিন আমার সাথীদের সাথে ঐ সকল জায়গা পরিদর্শনে গেলাম। আক্রমণের সময় এবং পলায়নের পথ নির্ধারণ করলাম। প্রথম স্তরের সিরিয়ালে আমি রেডিও ট্রান্সমিশন পুল এরিয়া, দুই নম্বরে আইভি হেড কোয়ার্টার, তিন নম্বরে তিনটি জায়গা যথা- আর্মি এয়ার ফোর্স এবং নেভাল রিক্রুটিং সেন্টার সাব্যস্ত করলাম। এ সকল স্থানের বৈশিষ্ট্য একটা এটাও যে, এখানে আক্রমণের সময় প্রতিরোধের কোন সুযোগ নেই। আমার সাথী ও ছেলেদের গ্রুপওয়ারী আক্রমণ করা এবং দুইজন দুইজন করে পলায়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। আমি আমার নতুন সহযোগীর সাথে যোগাযোগ করে অতিরিক্ত পনেরটি টাইম বোম চাইলাম। সে এক সপ্তাহের সময় চাইল। আমার ইচ্ছা, ছেলেরা ও আমার সাথীরা যদি এ অপারেশনে সফল হতে পারে তবে তাদের দ্বারা এর চেয়ে বড় মিশন বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করব। যে মিশন সম্পর্কে আমার সিনিয়র আমাকে প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বলেছিল, এ মিশন আমাদের Prestige matter-এ পরিণত হয়েছে। ভারতে অবস্থানকালে আমি যখনই এ মিশন নিয়ে ভেবেছি তখনই আমার সাথীদের সংখ্যার স্বল্পতা ও মিশন বাস্তবায়নের উপযুক্ত সরঞ্জামের স্বল্পতা প্রতিবন্ধক হয়েছে। এখন এ সকল নির্ভীক ছেলেদের কারণে আমাদের সংখ্যা স্বল্পতা দূর হয়েছে এবং এখন নতুন সহযোগীর মাধ্যমে যে কোন ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করাও সম্ভব। আমার সিনিয়রও এ নতুন ব্যবস্থাপনা সম্ভবত এজন্য করেছেন যে, আমাদের অতীত কর্মসূচী তার মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার নিজের Prestige mission -এ আমাদের সফলতার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ মিশন হচ্ছে এই যে, ঐ বিমান বন্দর যার রানওয়ে ফাইটার বিমানের পার্কিং পাম্প ও ফুয়েলিং-এর ব্যবস্থা পাহাড়ের গহীনে সুড়ঙ্গ খনন করে করা হয়েছে এবং রানওয়ের এক তৃতীয়াংশ পাহাড়ের ভিতরেই রয়েছে। সেখানে ভারত তার মিগ-২১ ছাড়াও ফ্রান্স নির্মিত মিরাজ বিমানও সংরক্ষণ করছে।

আমরা প্রথম দিনে রেডিও ট্রান্সমিটার পুল ও আইভি হেড কোয়ার্টারে সকাল সাতটায় এবং আর্মি ও এয়ার ফোর্স রিক্রুটমেন্ট সেন্টারে বিকাল ছয়টায় আক্রমণের সময় নির্ধারণ করলাম। এ সময়ে প্রতিরোধের সম্ভাবনা খুবই কম। এতে যদি তাদের জানের ক্ষতিও হয় তবে তা হবে খুবই কম। একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন চারটি স্পর্শকাতর স্থানে বোম ধামাকার ধ্বংসযজ্ঞ ভারতের রাজধানীসহ সারা ভারতকে কাঁপিয়ে তুলবে। আমি কয়েকবার সেই টার্গেটের চার জায়গায় গিয়ে আক্রমণের পর পলায়নের পথ খুঁজে বের করেছি। সমস্যা শুধুমাত্র রেডিও ট্রান্সমিটার পুলে আক্রমণের পর পলায়নের পথ খুঁজে বের করতে হয়েছে। কেননা, ট্রান্সমিশন পুল দিল্লীর ইন্ডাস্ট্রিরিয়াল এরিয়ার পর মহনজিটি রোডে দিল্লীর সন্নিকটে ৩০ কি.মিটার দূরত্বে অবস্থিত। এর সমস্ত এরিয়া কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। ভিতরে প্রবেশের একটিমাত্র পথ এবং ট্রান্সমিশন পুলের মধ্যখানে রেলওয়ে স্টেশনের দুটি কামরা এবং গার্ডদের জন্যে দুটি কামরা নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এক সময়ে আমি মাত্র দু'জন গার্ডকে দেখতে পেলাম। যারা অধিকাংশ সময় গার্ডরুমেই। কেননা বৃষ্টির কারণে রোদের তাপ সহ্য করা তাদের জন্য সহজ নয়। পিছন দিক দিয়ে কাঁটা তার কেটে গার্ডদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছা খুবই সহজ। সমস্যা শুধুমাত্র বোম রেখে রোডে ফিরে আসা ও সেখান থেকে দিল্লী ফিরে আসায়। এ সমস্যার সমাধান এভাবে করলাম যে, বোম অন করা ও ফাটার মধ্যখানে বিরতি হবে ৪৫ মিনিটের। আর ফিরে আসার জন্য গাড়ি রেডি রাখার দায়িত্ব আরিফকে দিলাম।

* * *

আইভি ইন্টিলিজেন্সের কোয়ার্টার পুরাতন দিল্লীর এক পুরনো বিল্ডিংয়ে অবস্থিত। এই বিল্ডিংয়ের প্রবেশ পথ ও মোঘল যুগের এত বিশাল আকৃতির যে সে প্রবেশ পথ দিয়ে একটি বড় হাতি অনায়াসেই প্রবেশ করতে পারে। এ প্রবেশ পথের পরেই রয়েছে এক বিশাল মাঠ। যেখানে আমলাদের ও সরকারী গাড়ি পার্কিং করা হয়। এ মাঠেরই তিনদিকে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েকটি কামরা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ কামরাগুলোতেই রয়েছে টর্চার সেল ও লকআপ। প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ মাঠেরই পার্কিং লনের সরকারী গাড়ির অন্দরে বোম রাখতে হবে। এতে করে সরকারী গাড়ির উভয় পাশের গাড়ি ধামাকার ক্ষতি থেকে রক্ষা

পাবে। এ কোয়ার্টারে সকাল সাতটায় সুইপারের বেশে সেই গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা এবং গাড়িতে বোম রেখে ফিরে আসা সহজই, কঠিন কোন কাজ নয়। এ আক্রমণের লিস্ট থেকে নেভাল রিক্রুটিং সেন্টারকে কেটে দিয়েছি। পক্ষান্তরে আমি ওরিক্রেটিং এয়ারফোর্স সেন্টারে বিকাল ৪টার পর সাধারণত দুই তিনজন গার্ড ও সুইপার উপস্থিত থাকে। এ উভয় স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল চার থেকে পাঁচ ফিট উঁচু। এ বাউন্ডারী ওয়াল টপকিয়ে মূল ভবনের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছা এবং বোম ফটক বন্ধ থাকলে জানালার গ্লাস কেটে ভিতরে রেখে নিরাপদে ফিরে আসা কঠিন কোন কাজ নয়। এ দু'জায়গায়ই বোম ফাটার সময় আধা ঘণ্টা সেট করা হবে– এটা সিদ্ধান্ত হল। এ উভয় সেন্টারই নতুন দিল্লীর দূতাবাসসমূহের সন্নিকটে জিনপুত এলাকায় অবস্থিত। এ ধামাকা চালাতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সে সকল সম্ভাবনাময় সমস্যাগুলো নিয়ে সাথীদের সাথে কয়েকবার পরামর্শ করলাম এবং ছেলেদেরকেও কয়েকবার রিহার্সেল করালাম। এভাবে আমাদের হোম ওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এ কথাতে আমরা একমত যে, অপারেশন পরিচালনা করা হবে। শুধু তাই না প্রস্তুতি শেষ করে অপারেশনের সময়ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখন বাকি শুধুমাত্র বোম হাতে আসার পর দিন তারিখ ঠিক করা। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এ আক্রমণ সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারে করা হবে। রবিবার এজন্য নির্ধারণ করলাম যে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ার কারণে হেড কোয়ার্টারে বহু গাড়ি জমা হবে। অপরদিকে রিক্রুটিং সেন্টারও কোলাহল মুক্ত হবে। অন্য দিনে অনেক সময় বিকাল বেলায়ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের টেস্ট অব্যাহত থাকে। ছুটির দিন হওয়ার কারণে এ আশঙ্কাও বাকি থাকবে না।

আমার নির্দেশ মত আমার সাথীরা ধারালো তারকাঁটার জন্য একটি বড় কাটার, রবারের বড় হাত মোজা, সুইপারের বিশেষ পোশাক, গ্লাস কাটার জন্য হীরার কলম, আওয়াজহীনভাবে গ্লাস পৃথক করার জন্যে ভেকিউম, নিজেদের ও ছেলেদের জন্য ক্যানভাস সু এবং উলের টুপি (যা খুলে ঘাড় পর্যন্ত ঝুলানো যায়। তখন শুধুমাত্র অর্ধেক চেহারা দেখা যায়।) ক্রয় করেছে এবং এ টুপির পেছন দিকে শুধুমাত্র চোখের জায়গা পরিমাণ কাপড় ছিদ্র করেছে। ধামাকার সময় এ টুপি পরার প্রয়োজন হলে তখন তাদের যেন কেউ চিনতে না পারে। মোটকথা, প্লান অনুযায়ী আমাদের সকল

প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এবার আমাকে শুধুমাত্র এ মিশন মনিটর করতে হবে। সশরীরে অংশগ্রহণ করতে পারবো না। এদিকে পূর্বঘোষিত স্থানে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে দুই ব্রিফকেস ভর্তি ১৫টি বোমও পেয়ে গেলাম। আমার সাথীদেরকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য চার জায়গায়ই বোম প্লান্ট করার জন্য আমি তাদের দায়িত্ব দিলাম। ছেলেরা তাদের কভার দিবে। সকালের গ্রুপের মধ্য হতে এক গ্রুপকে বিকাল বেলা অন্য এক টার্গেটেও হামলা করতে হবে। এই গ্রুপ আমার জুড়ো কারাতেতে দক্ষ সাথীর তত্ত্বাবধানে থাকবে। আমার দুই নম্বর সাথী বহু পীড়াপীড়ি করল চার জায়গার মধ্য হতে কোন এক স্থানে তাকে দায়িত্ব দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। আর অনুমতি না দেয়ার কারণ, আমাদের ট্রান্সমিটার অপারেটর একমাত্র সে। আল্লাহ না করুন মিশন যদি ব্যর্থ হয় তবে পাকিস্তানের সাথে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া এ মিশন পরিচালনার জন্য আমি পাকিস্তান থেকে অনুমতিও নিইনি। পাকিস্ত ান থেকে আমাকে একটি জেনারেল নলেজ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ঐ কাজ করবে যার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সে নলেজেরই আলোকে আমি এ মিশন সাজিয়েছি।

* * *

আমি পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা সাথীদের নিয়ে ছেলেদের সাথে মিটিং করলাম। আরিফ ও নাজির এ মিটিং-এ উপস্থিত ছিল। আমি তাদের সর্বশেষ দিকনির্দেশনা দিয়ে বললাম যে, আগামী রবিবার এ মিশন বাস্ত বায়ন করতে হবে। আমার সাথীদের কাছে তাদের নিজস্ব অস্ত্র রয়েছে। বশীরের সেলফ থেকে পাওয়া অস্ত্রের মধ্য হতে তিনটি রিভলবার এবং গুলি তিন গ্রুপের মধ্য হতে স্মার্ট ছেলেদের প্রদান করলাম এবং বললাম যে, অস্ত্রের ব্যবহার শুধুমাত্র ঐ সময়ই করা যাবে, যখন এটা ছাড়া আর কোন পথ বাকি থাকবে না। মিশন শেষে অস্ত্র আমার সাথীদের কাছে ফেরত দিয়ে যেতে হবে। আরিফকে দায়িত্ব দিলাম গাড়ির ব্যবস্থা করে ট্রান্সমিশন পুল পর্যন্ত চারজনকে নিয়ে যাওয়া ও ফেরত নিয়ে আসার। মোটকথা, সমস্ত ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত করার পর দিকনির্দেশনা দিয়ে সাথীদের ঘরে ফিরে এলাম। তারপর সাথীদের ঘরে রেখে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরে আসার পূর্বে সাথীদের পৃথকভাবে সর্বশেষ সতর্ক করে বললাম, এ গ্রুপের মধ্য হতে একটি ছেলেও যদি অনুপস্থিত হয় তবে

মিশন মূলতবী হবে। বশীরের নিহত হওয়ার ঘটনা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। যার ফলে আমি কারও উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। এ মিশনের বিস্তারিত বিবরণ আমি প্লানিং-এ ব্যক্ত করেছি। তাই এখন আর দ্বিতীয়বার বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

রবিবারের সকাল সাতটার মধ্যেই আমি সাথীদের ঘরে পৌঁছে গেলাম। তারপর নাজির আমি ও আমার দুই নম্বর সাথী নাজিরের ড্রয়িংরুমে বসে মিশনের ফলাফলের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলাম। মিশন শেষে সর্বপ্রথম আইভি হেড কোয়ার্টার গমনকারী গ্রুপের দায়িত্বশীল এলো। সে জানাল, সুইপারের বেশে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। সে মধ্যবর্তী গাড়িতে বোম রেখে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছে। রিভলবারধারী ছেলে রিভলবার তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার পর পৃথক পৃথকভাবে তারা চারজন মেইন রোডে চলে এসেছে। আনুমানিক এক ঘণ্টা পর আরিফ আমার সাথীদের সাথে ফিরে এসে সফলতার সুসংবাদ শোনাল। বোম ফাটার অনেক পূর্বেই উভয় গ্রুপ অপারেশন স্পট থেকে বহু দূরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে। এখন আমাদের পত্রিকার বুলেটিন ছাপার অপেক্ষার পালা। মিশনের বিবরণ ব্যক্ত করতে গিয়ে আরিফ বলল যে, আমি ট্রান্সমিশন পুলের সামনে মেইন রোডে গাড়ির বেল্ট উঠিয়ে গাড়ি ডিস্টার্বের বাহানা করে তাদের অপেক্ষা করতে থাকলাম। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি যে, আমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

এভাবে কিছু সময় কাটানোর পর চারজনই তাদের মিশন সম্পন্ন করে দুলতে দুলতে গাড়ির কাছে ফিরে এল। আর তখনই আমি তাদের নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল্লী চলে এলাম।

দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা নাজির তার ওখানেই করেছে। আমাদের খানা পাকানোর ঝামেলা নেই। দুপুরের খানা শেষ করে আমি আমার দুই নম্বর সাথীকে বাইরে পাঠালাম এজন্য যে, এতক্ষণে যদি কোন বুলেটিন ছাপা হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পর আমার দুই নম্বর সাথী আনন্দে আটখানা হয়ে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় ফিরে এল। তার হাতে রয়েছে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় ছাপানো বুলেটিন। ইংরেজি বুলেটিনে আইভি হেড কোয়ার্টার ও ট্রান্সমিশন পুলে ধামাকার খবর রক্তাক্ষরে লিখে ছেপেছে। যার সারাংশ হচ্ছে এই যে, ইন্টিলিজেন্সের হেড কোয়ার্টারে বোমা হামলায় ৭টি গাড়ি তছনছ হয়ে গেছে। এছাড়া আরও বহু গাড়ি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ব্যক্ত করে নিন্দা করা হয়েছে ইন্টিলিজেন্সের। তাছাড়া নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। এ বুলেটিনেই আরও লেখা হয়েছে, ট্রান্সমিশন পুলে ধামাকা আক্রমণে রেলওয়ে স্টেশন পরিপূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং দিল্লীর রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। যোগাযোগমন্ত্রীরও পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। বিকাল পাঁচটার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার পাঁচটি বুলেটিন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। পত্রিকাওয়ালা কি জানে যে, সংবাদ সবেমাত্র অর্ধেক হয়েছে? আর বাকি অংশ সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে। মিশন সফলতার আনন্দে আমরা একে অপরকে মুবারকবাদ জানালাম। আর বিকালের অপারেশনের গ্রুপ বিশ্রাম নেয়ার জন্য তাদের কামরায় চলে গেল। আর আমি নাজিরের ড্রয়িংরুমে বসে একটু পর পর চা পান করতে থাকলাম। বিকাল পাঁচটার পূর্বেই মিশনের সাথীরা তৈরি হয়ে এল। তারপর আমার কাছ থেকে দুআ নিয়ে তাদের গন্তব্যে রওনা হল। এবারও আমার দুই নম্বর সাথী মিশনে যাওয়ার জন্য আবেদন করল। আমি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে তাকে বললাম, অচিরেই আমরা গুরুত্বপূর্ণ মিশন বাস্তবায়ন করব। সেখানে সবাইকে প্রত্যেকের যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হবে। সেই মিশনে মনভরে চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে প্রথম গ্রুপ অপারেশন শেষ করে ফিরে এল। নাজির ছেলেদেরকে বাইরে থেকে বিদায় জানাল। অপারেশনের বিবরণ দিতে গিয়ে আমার সাথী বলল, এয়ার ফোর্স রিক্রুটিং সেন্টারের হলরুম সংলগ্ন কামরার জানালার গ্লাস কেটে বোম ভিতরে ছুঁড়ে মেরেছি। বোম রাখতে গিয়ে কারও সাথে কোন প্রকার লড়াই করতে হয়নি। ফেরার পথে ছেলেরা রিভলবার আমার কাছে জমা দিয়েছে। তার কারগুজারি শেষ হল। এখন আমরা সকলেই অপেক্ষা করছি শেষ গ্রুপের অপারেশন শেষ করে নিরাপদে ফিরে আসার। আমাদের আর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ক্ষাণিক পরই আমাদের সাথী অপেক্ষার পাহাড় মাড়িয়ে মুচকি হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে এল। এ সাথীর আজ এটা দ্বিতীয় মিশন ছিল। আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম, কিভাবে কি করেছ? কোন সমস্যা হয়েছে কিনা? জবাবে সে তার বক্তব্য শুরু করে, আমি গ্লাস কেটে পৃথক করার সময় হাত ফসকে গ্লাস নিচে পড়ে গেছে। গ্লাস নিচে পড়ার আওয়াজ শুনে এক সেন্ট্রি এদিকে দৌড়ে এল। তার হাতে ছিল রাইফেল। আমি সেন্ট্রির

বুটের আওয়াজ পেয়ে একদিকে লুকিয়ে গেলাম। সেন্ট্রি এসে ভাঙ্গা গ্লাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এমতাবস্থায় আমাকে কভারকারী একটি ছেলে পিছন থেকে এসে চাকু দিয়ে সেন্ট্রির ঘাড় কেটে ফেলে। এ সকল কাজ আট দশ সেকেন্ডের মধ্যে হয়েছে। তারপর আমি আরামের সাথে বোম জানালার সাথে পরিত্যক্ত চেয়ারে রেখে দিয়ে সকলেই ফিরে এসেছি।

পরদিন সকাল বেলা দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম, চার জায়গার ধ্বংসলীলার চিত্রে ভরপুর। পত্রিকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আইভি হেড কোয়ার্টারে ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়ি এবং ট্রান্সমিশন লাইনের রিলে স্টেশান-এর ক্ষতিগ্রস্ত কামরা ও মেশিনারিজের ছবি। আর্মি ও এয়ার ফোর্স রিক্রুটিং সেন্টারের ছবি ছাপা হয়নি। পত্রিকায় এটা লেখা হয়েছে যে, উভয় ভবনে বোম ধামাকা হয়েছে এবং যে কামরায় ধামাকা হয়েছে সেই কামরা ধসে পড়েছে। আর্মি জওয়ানরা উভয় ভবন বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে। অপরদিকে গার্ড নিহত হওয়ার খবর সরকারীভাবে গোপন করা হয়েছে। তবে যে সকল সাংবাদিক ঘটনাস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে তারা সুইপার মারফত জানতে পেরেছে যে, এ ধামাকায় একজন গার্ডও নিহত হয়েছে।

এ ঘটনার সফলতায় আমাদের মাঝে বইছে আনন্দের বান আর সারা ভারতে বিশেষ করে রাজধানীতে বিরাজ করছে পিনপতন নীরবতা এবং জনসাধারণের মাঝে টর্নেডোর মত ছড়িয়ে পড়েছে নিরাপত্তাহীনতা ও বোমাতংক। কয়েকদিন পর্যন্ত এ ধামাকার বেদনাময় সংবাদে জাতীয় দৈনিকগুলো ঠাসা রইল। এ ধামাকা ভারতের সর্বমহলে এমন প্রভাব ফেলল যে, ট্রিবিউন পর্যন্ত তাদের প্রচার মাধ্যমে একথা লিখতে বাধ্য হলো যে, 'দেশের তথা জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য গঠন করা হয়েছে আইভি আর্মি ও এয়ার ফোর্স। পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়েছে যে, তারা দেশের নিরাপত্তা বিধান করবে তো দূরের কথা নিজের নিরাপত্তা বিধানেই ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাদের নিরাপত্তার জন্য নতুন আরেকটি বিশেষ ফোর্স গঠন করা অপরিহার্য হয়ে গেছে। পরিস্থিতির এ নাজুকতায় বিরোধী দল ফায়দা লুটতে ভুল করলো না। তারা এ ধামাকাকে ইস্যু বানিয়ে সরকারী দলের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলল। পরিশেষে এ ধামাকাকে কেন্দ্র করে বিধান সভায় ঘটল তুলকালাম কাণ্ড। অপর দিকে জাতীয় দৈনিকগুলো এ ধামাকার দায়ভার পৃথক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীদার শিখ সম্প্রদায়ের উপর চাপালো। আর কিছু পত্রিকা কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের উপর

চাপালো। এই ধামাকার কয়েকদিন পূর্বেই তামিলনাড়ুর (মাদ্রাজ) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো সাবেক তামিলনাড়ুর শাসক শ্রেণীর প্রতিশোধ হিসাবেই আখ্যায়িত করল। এ ধামাকার পর দিল্লী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দশ পনের দিন লেগে গেল। ভারতের মূর্তিপূজারীরা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে দু'টুকরো করেছে ঠিকই, তবে তাদের জন্মগত কাপুরুষতার কারণে সর্বদাই পাকিস্ত ানকে ভয় পেত। এ ভয়-আতঙ্ক সর্বদাই তাদের মাঝে বিরাজ করত যে, না জানি কবে আবার এ আহত সিংহ বদলা নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। একটি মুসলিম দেশ বিভক্ত হওয়ার কারণ হল তদানীন্তনকালের শাসকদের কাপুরুষতা ও ভারতের তোষামোদী এবং পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা। যার কারণে এ পরাজয়ের বদলা পাকিস্তান নিতে পারেনি এবং হাজার বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুংকার প্রদানকারীরা কাশ্মীরের সিজ-ফায়ার লাইনকে কন্ট্রোল লাইন নির্ধারণ করে এবং এর পিছনে আজাদ কাশ্মীরের সিজ-ফায়ার লাইনের নিকটবর্তী সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ীদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই উপহার প্রদানের সাথে তারা রেশমের রাজপথের পাহাড়ও ভারতকে দিয়ে দিয়েছে। কেননা ভারত এ পাহাড়ে শুধুমাত্র একটি হেভী মেশিনগান ও একটি মর্টার বসিয়ে ভারত রেশমের রাজপথ বন্ধ করতে সক্ষম।

এ ঘটনার পর আমি দেখলাম যে সাথীদের মলিন চেহারা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় রূপ নিয়েছে। হতাশার ছাপ দূরীভূত হয়ে তাদের মাঝে ফিরে এসেছে নবচেতনা। মূলত কোন মিশনকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনে এটাই ছিল তাদের জন্য প্রথম মিশন যাকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছে। আমি আরিফের মাধ্যমে প্রত্যেক ছেলেকে দুই হাজার করে টাকা পাঠালাম এবং আগামী বিশদিন পর্যন্ত তাদের নরমাল থাকতে বললাম। এমন কি একে অপরের সাথে সাক্ষাত করতেও নিষেধ করলাম। আর এ নিষেধাজ্ঞা এজন্য জারি করলাম যে, ডিএমআই ছাড়াও আইভি এয়ার ফোর্স এবং আর্মি গোয়েন্দাদের ইউনিটও সর্বত্র আক্রমণকারীদের খুঁজে ফিরছে। এ গোয়েন্দাদের শ্যানদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সাথীদেরকেও সতর্ক থাকতে বললাম। ভারতের ইংরেজি ও হিন্দী ভাষার যতগুলো পত্রিকায় এ ধামাকা সংক্রান্ত সংবাদ ছেপেছে সে সকল পত্রিকা আমি ক্রয় করেছি।

পরবর্তীতে এ সকল পত্রিকা আমি পাকিস্তান পাঠিয়েছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমাদের দেশীয় গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ভারতের গোয়েন্দা ও সীমান্ত স্মাগলারদের একটি টীম অবশ্যই থাকবে। যারা এ হিন্দি পত্রিকা তাদেরকে পড়ে শোনাবে।

আনুমানিক এক মাস পর আমি আবার সাথী ও ছেলেদের একত্রিত করে বললাম, আমাদেরকে দিল্লী থেকে বহুদূরে এক বড় মিশন সফল করার জন্য যেতে হবে। এজন্য তোমরা সকলেই মানসিক ও শারীরিক সর্বদিক থেকেই নিজেকে প্রস্তুত কর। আমি এ মিশনে আমার সাথীদের মধ্য হতে তিনজনকে এবং তোমাদের (ছেলেদের) মধ্য হতে তিনজনকে নিয়ে যাব। এবার আমার মিশন হচ্ছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গে লুকায়িত ভারতের বিমান বন্দর।

ভারতের এই বিমান বন্দর সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। এখন যদি ভারত থেকে পাকিস্তানে তথ্য নিতে চাই তবে এটা হবে হাস্যকর বিষয়। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, এই বিমান বন্দর পাহাড়ী এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর অধিক তথ্য শুধুমাত্র এই বিমান বন্দরের নিকটতম শহর গোরখপুর থেকেই অর্জন করা সম্ভব। বোমা হামলার কারণে দিল্লীতে যে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। তবে ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং সামরিক এজেন্টরা পুরো দমে তৎপরতা শুরু করেছে এবং গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা সর্বত্র বোমা হামলাকারীদের খুঁজে ফিরছে। এ পরিস্থিতিতে আমরা সাধারণ ডাক গ্রহণ ব্যতীত সকল তৎপরতা বন্ধ করে দিলাম। আমরা নিত্য নতুন তথ্য লাভের জন্য যশোবন্তকে পুল বানিয়েছি। তার প্রিয়তমা সুমীর দাবি পূরণার্থে সপ্তাহে দু'বার নিয়মিতভাবে সে আমাদের ডাক দিয়ে যাচ্ছে। এদিকে আমরা এমন জানবাজ সাহসী ছেলেদের গ্রুপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি যারা যে কোন বিপজ্জনক কাজ করতে সর্বদা প্রস্তুত।

আমার সিনিয়র আমাদের এ অপ্রত্যাশিত সফলতায় খুবই আনন্দিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত গোরখপুরের মিশনের সফলতার ফিফটি ফিফটি নিশ্চয়তা না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সিনিয়রকে এ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে চাচ্ছি না। আর বলতে না চাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সফলতার ক্রমধারায় ব্যর্থতার কালিমা লেপন না করা। আমার বসের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য দশ দিনের ছুটি তো মঞ্জুর হয়েছে। এ

ছুটিকে কাজে লাগানোর জন্য আমি ১৯৭৩ সনের মে মাসে আমার দুই সাথী ও তিন ছেলেকে নিয়ে গোরখপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর মাঝে প্রত্যেক সপ্তাহে আমি সার্ভিস ক্লাবে কর্নেল শংকরের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আশার সাথেও তিন চারবার সাক্ষাত হল। আশা তো একজন স্বাধীনচেতা নারী। সাক্ষাতে আশা আমাকে জানাল যে, সে এখন এতখানি Depress হয়েছে যে, জয়চাঁদকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতেও প্রস্তুত। সে জয়চাঁদ থেকে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ অসিয়ত লিখে নেয়ার জন্য তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে। জয়চাঁদ আশার ভালবাসার ফাঁদে পড়ে তাকে সতীনের সন্তানদের রোষানল থেকে হেফাজতের জন্য অচিরেই তার নামে মোটা অংকের টাকা ও জমি লিখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা আমাকে এও বলল যে, জয়চাঁদ যখনই আমাকে এসব লিখে দিবে তখনই আমি তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিব। অর্থ ও সম্পদের বিনিময়ে আমি এ বৃদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমার সোনার যৌবনকে গলাটিপে হত্যা করতে পারব না। অপরদিকে যশোবন্ত তার বিনিময় বৃদ্ধি করার আবেদন করেছে। আমি কোমলভাবে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোন জ্যাকপট আমরা না পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার বিনিময়ে বৃদ্ধি কামনা করা উচিত নয়। তুমি যদি আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলী প্রদান করতে অস্বীকার কর তবে এর শেষ পরিণতি যে শুভ নয় তাও খেয়াল রাখবে, কেমন?

আমাদের সকল কাজ রুটিন মাফিক ভালভাবেই হচ্ছে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি আমার দুইজন সাথী ও তিনজন ছেলেকে নিয়ে গোরখপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। গোরখপুরে পৌঁছে আমার সাথী ও ছেলেদের থাকার জন্য মধ্যম স্তরের একটি হোটেলের কামরা ভাড়া করলাম। আর আমি সিভিল লাইনের নিকটবর্তী একটি উন্নত হোটেলে কামরা নিলাম। আমি সাথীদের সতর্ক করে বলে দিয়েছি যে, ছেলেদেরকে তোমরা চোখে চোখে রাখবে। তারা যাতে এমন কোন কাজ করতে না পারে যার দ্বারা আমাদের আগমন সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। গোরখপুর দিল্লীর তুলনায় একটি ছোট শহর। সন্দেহময় চাল-চলন সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

পরে আমি সাথীদের হোটেলে গেলাম এবং একজন সাথীকে একটি ছেলে দিয়ে এভাবে দু'টি দল তৈরি করলাম এবং একটি ছেলেকে আমার সাথে নিয়ে শহর সার্ভে করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি সাথীদের

বললাম, যদি কারও সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় তবে ছেলেদেরকে কথা বলতে দিও। আর তোমরা চুপ থেকো। ছেলেদের বচনভঙ্গি দিল্লীবাসীর মতই। আর আমার সাথীদের বচনভঙ্গি হচ্ছে পাঞ্জাবী উর্দু। দিল্লীতে সবই চলে। তবে এখানকার পরিস্থিতি তার ব্যতিক্রম। গোরখপুর উত্তর প্রদেশের হিমালয় পর্বতের চাদরে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত। এই শহর নেপাল সীমান্তের নিকটবর্তী। এখানে রেলওয়ে জংশন ছাড়াও ভারতীয় সেনা ছাউনীও রয়েছে। আমরা সারা দিন সমগ্র শহরে চক্কর লাগালাম। এই শহর মধ্যম ধরনের শহর। আমরা শহরে এয়ার ফোর্সের উর্দি পরিহিত কোন সদস্যকে দেখতে পেলাম না। এভাবেই ঘুরেফিরে দিনটি শেষ হল। প্রথম দিনের মত পরের দিনও সারা শহর ঘুরে কাটালাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কোন সন্ধান বের করতে পারলাম না, যার দ্বারা বিমান বন্দরের সত্যায়ন হতে পারে। কোন অপরিচিত লোকের নিকট বিমান বন্দর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা খুবই বিপজ্জনক কাজ। আমার খুব ভাল করেই মনে আছে মেজর আহসানের মুসলমান চাকরের প্রতি ভরসা করার শেষ পরিণতির কথা। তাই বিমান বন্দরের সন্ধান আমাদেরকেই করতে হবে। তৃতীয় দিন আমি ছেলেদের নিয়ে শহরের বাইরে একটি রোডে যাচ্ছি, এমন সময় আমি একটি প্রেট্রোল ট্যাংকার দেখতে পেলাম। গতিতে বুঝতে পারলাম, ট্যাংকটি খালি। রিকশাওয়ালাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় জবাবে সে বলল, সারা শহরের পাম্পে এখান থেকেই প্রেট্রোল সাপ্লাই করা হয়। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে আরও দুটি ট্যাংক আছে। কিন্তু সেই ট্যাংকের পেট্রোল শুধুমাত্র সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত। আমার কাছে এ তথ্য হল আকর্ষণীয়। আমি রিকশাওয়ালাকে শহরে ফিরে যেতে বললাম। শহরে এসে এ রিকশা ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকটি রিকশা নিয়ে সাথীদের হোটেলে চলে গেলাম। সন্ধ্যা বেলা সবাইকে একত্রিত করলাম। তারপর তাদেরকে বললাম, আগামীকাল তোমরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকট অয়েল ট্যাংকের সন্ধান করবে এবং সারাদিন অয়েল ট্যাংকের রোডে গমনকারী অয়েল ট্যাংকারের নম্বর এবং কালার নোট করবে। বিশেষ করে ঐ ট্যাংকারের প্রতি খেয়াল করবে যার উপর HIGHLY INFLAMMABLE এর সাথে 100 p.c. OCTANE লেখা হবে। কেননা ফাইটার বিমানে খুবই পরিষ্কার ও নির্ভেজাল পেট্রোল ব্যবহার করা হয়। আমার সাথীরা দুইদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঐ

কাঙ্ক্ষিত ট্যাংকারের সন্ধান বের করেছে। যার মাটি রঙে কোমোফ্লাজ করা। আমার সাথীরা সেই তেল বহনকারী ট্যাংকারের পিছু নিয়ে পাঁচ ছয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ঐ চৌরাস্তাও চিনে এসেছে যেখানে গিয়ে ট্যাংকার অন্য পথে চলেছে। আর ঐ পথ গোরখপুরের উত্তর পশ্চিম দিকে চলে গেছে। পরদিন আমি একজন সাথীকে নিয়ে সেই পথ ধরে বহুদূর অগ্রসর হলাম। এর মধ্যে দেখতে পেলাম, এ রোডের শাখা রোডগুলো এবড়ো থেবড়ো ও ভাঙ্গাচোরা। পক্ষান্তরে এই মেইন রোড হচ্ছে পিচঢালা কার্পেটিং করা এবং অত্যন্ত মজবুত। এ রোডে কোন ট্রাফিক নেই। একশ' পার্সেন্ট পরিষ্কার তেলবাহী ট্যাংকার এবড়ো থেবড়ো পথে যায় না। কেননা ভাঙ্গা রাস্তার ঝাকুনিতে তেল এমনি এমনি উতলিয়ে উঠবে। এ সকল দিক বিবেচনা করে আমি নিশ্চিত হলাম যে, এ কার্পেটিং করা রোডই বিমান বন্দরে চলে গেছে। আর এই বিমান বন্দর গোরখপুরের সীমান্ত থেকে বেশ দূরেই হবে।

*　　*　　*

গোরখপুরে আরো দুদিন থাকার পর আমরা অতিরিক্ত যে তথ্য অর্জন করলাম তা হচ্ছে এই যে, এই রোডে আরও কিছু সামনে গেলে পরে একটি চেকপোস্ট পড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে যাওয়া যাবে না। এই চেকপোস্টের পরে বিমান বন্দরের কর্মচারীদের কোয়ার্টার। আর এ কোয়ার্টারের পরেই রয়েছে অফিসারদের কলোনী। এ কলোনীর পরে আরেকটি চেকপোস্ট রয়েছে যেখানে দুইটি অফিসার মেস রয়েছে। এ মেসে পাইলট ও সিঙ্গেল সিনিয়র অফিসাররা থাকে। অফিসার মেসের পর রোড একটি পাহাড়ের পাশে ঘুরে গেছে। আমরা এই তথ্য বহু কাঠ-খড় পুড়ানোর পর এক মধ্যবয়সী ড্রাইভার থেকে সংগ্রহ করেছি।

সে কলোনী নির্মাণকালে এক ইঞ্জিনিয়ারকে কলোনী পর্যন্ত নিয়ে যেত। তার কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা এক শরাবখানার বাইরে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে পেয়েছি। যখন আমি ও আমার সাথী মিলে তাকে এই রোডে যাওয়ার জন্য বুক করতে চাইলাম তখন সে আমাদের বলল, আবাসিক কলোনীতে যার সাথে সাক্ষাত করতে যাবেন প্রথম চেকপোস্টের আগেই টেলিফোনে তার অনুমতি নিতে হবে। এরপর ড্রাইভার আরও বললো যে, বাবু! আপনি যার সাথে দেখা করতে যাবেন তাকে টেলিফোনে বলে দিন

সে যেন আপনার নাম এবং আমার নাম ও ট্যাক্সি নম্বর চেকপোস্টে লিখে পাঠায়। যদি সে পাঠায় তবেই আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব। ড্রাইভারের কথা শুনে আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম। বাহ্যিকভাবে আমরা এমন কোন পথ পেলাম না যাতে করে আমরা আবাসিক কলোনী অথবা অফিসার মেস পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। এর সামনে যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। এইদিন সন্ধ্যাবেলা সাথীদের একত্র করে সেখানকার চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং পরে আমরা নিরাশ হয়ে দিল্লীর পথ ধরলাম।

ফিরার পথে ও দিল্লী পৌঁছেও আমি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বিমান বন্দরে পৌঁছার সম্ভাবনাময় অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বুঝে উঠতে পারলাম না যে, এই বাধার প্রাচীরকে কিভাবে অতিক্রম করব। ড্রাইভার যে তথ্য দিয়েছে তাও তো কয়েক বছর পূর্বের কথা। এখন তো বিমান বন্দর পরিপূর্ণরূপে অপারেশনাল। এখন কি পূর্বের সিকিউরিটি ব্যবস্থা বহাল আছে না তাতে নতুন কোন নিয়ম চালু করা হয়েছে– এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। ধীরে ধীরে এই মিশন আমার ব্রেন থেকে মুছে যেতে লাগল। পরিশেষে 'মিশন ইম্পসিবল' মনে করে আমরা সকলে এটাকে ভুলে গেলাম।

এরপর দিল্লীতে আমাদের স্বাভাবিক কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। নিয়মানুযায়ী ডাকের আদান প্রদান চালু রয়েছে। আমার সাথী ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সপ্তাহে দু'বার বশীরের গ্যারেজে যায়। আর আমি প্রত্যেক সপ্তাহেই কর্নেল শংকরের সাথে সাক্ষাত করি। এভাবেই কেটে যায় বহুদিন এবং শুরু হয়ে যায় শীতকাল।

এ বছর আমরা নববর্ষের স্বাগতম ধামাকা দিয়ে করার পরিবর্তে হোটেলের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে করলাম। ১৯৭৪-এর ২৬শে জানুয়ারির প্যারেডও আমরা নীরবে অবলোকন করলাম এবং প্যারেড প্রদর্শিত অস্ত্রের ছবি তুলে পাকিস্তানে পাঠালাম। আমি পাঠকদের সংশয় দূর করতে বলতে চাই, আমাদের এই আট নয় মাসের নীরবতা অস্বাভাবিক কোন কাজ নয়। ভারতে অবস্থান করে কেউ যদি প্রত্যেকদিন একটি করে মিশন সফল করার দাবি করে তবে তা হবে অবাস্তব ও কল্পনার কথা।

ভারতে আমাদের অবস্থানের প্রত্যেক দিন হচ্ছে আমাদের মিশনের সফলতা। যেমন- অন্যান্য রাষ্ট্রে পাকিস্তানের এমবেসী একমাত্র পাকিস্ত

ানের কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই দূতাবাস যদি কোন কাজ নাও করে তথাপি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিশ জন কর্মচারীর উপর বছরে কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয়। ঠিক তেমনি আমরা ভারতে আমাদের অফিসের প্রতিনিধি। আমাদের অফিসের প্রতিটি নির্দেশ পালনে সদা তৎপর। আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্জনের পথ বের করেছি। প্রদানকৃত সকল মিশন সফলভাবে পূর্ণ করেছি। জানবাজ ছেলেদের একটি টিম তৈরি করে প্রদানকৃত ছাড়াও আরও বহু মিশন সফল করেছি। এ সকল কৃতিত্বের কারণেই আমাদের সিনিয়র ভারতে আমাদের অবস্থানের অনুমোদনকে দীর্ঘায়িত করেছেন। গোপন এক পত্রে আমাকে এটাও বলা হয়েছে, আমিসহ আমার কোন সাথী যদি ভারতে কোন নারীকে বিয়ে করতে চাই তবে তারও অনুমতি আছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান ফিরে আসার পর আমাদের স্ত্রীদেরকে পাকিস্তানের নাগরিকত্বও প্রদান করা হবে।

বশীরের গ্যারেজকে ছেলেরা উত্তমরূপেই গুছিয়ে নিয়েছে। আমি সপ্তাহে একদিন গ্যারেজে যাই এবং ছেলেদের সাথে প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলি। ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ের একদিন আমি বশীরের গ্যারেজে বসে আছি। এমন সময় দেখতে পেলাম যে একটি ট্রাক মেরামতের জন্য গ্যারেজে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মেকানিক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ট্রাকের সমস্যা কি? জবাবে ছেলেটি বলল, চলার সময় এই ট্রাকের কেরেংকশাফিট আওয়াজ করে। মেকানিকের শীর্ষ এসে ট্রাকের পিছে জ্যাক লাগিয়ে তাকে উপরে উঠাতে চাইল। জ্যাক সবেমাত্র অর্ধেক উঠেছে এমন সময় আওয়াজ হল। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখন কি করবে? জবাবে মেকানিক ছেলেটি বলল, আমি চুরির বেল্ট তৈরি করে রেখেছি এবং ট্রাকের নিচে আমি শুয়ে ট্রাককে রোডে চালাব। চলন্ত অবস্থায় ট্রাকের কেরেংক শাফিট দেখে তা মেরামত করব। আমার সামনেই সে ছয় ইঞ্চি চুরির তিনটি বেল্ট ট্রাকের নিচে ফিট করল। এক বেল্ট তার ঘাড়কে আরেক বেল্ট তার কটিদেশের নিম্নভাগকে এবং তৃতীয় বেল্ট তার পাকে উঠিয়ে রেখেছে। ছেলেটি বেল্টে শয়ন করার পর ড্রাইভারকে ট্রাক চালাতে বলল। ট্রাক চলার সাথে সাথে কেরেংক শাফিটও ঘুরতে শুরু করেছে। ১৫ মিনিটের মধ্যে ট্রাক আবার গ্যারেজে ফিরে এল। এর মধ্যে মেকানিক সমস্যা নির্ণয় করে ফেলেছে। আধা ঘণ্টার মধ্যেই

মেকানিক সমস্যা দূর করে ফেলল। ট্রাক মালিক ২৫০ টাকা মেকানিককে দিয়ে চলে গেল।

মেকানিক ছেলে বেল্টের উপর শুয়ে ট্রাক চালিয়েছে এবং এ অবস্থায় এক কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছে। এতে তার গায়ে বিন্দুমাত্র আচড়ও লাগেনি। মেকানিকের এই চিত্র দেখে আমার মাথায় আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে আমি গোরখপুর বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে এপ্রিল পর্যন্ত পৌঁছার পথ আবছা আবছা দেখতে পেলাম। আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, এই বেল্টের দুর্বলতাকে দূর করে যদি এগুলোকে আরো 'আপ গ্রেড' করা হয় এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। তবে অয়েল ট্যাংকারের নিচে শয়ন করে সুড়ঙ্গের ভেতরে দাঁড়ানো জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হবে। আমি আমার সাথীদের কাছে এ বেল্ট সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং বললাম যে, যদি মজবুত বেল্ট সেই ট্রাকের নিচে ফিট করার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় তবে অয়েল ট্যাংকারের স্টেশনের নিকটেই অয়েল ট্যাংক থেকে পেট্রোল নেয়ার সময় অথবা মেইন রোডে রোড মেরামতকারীর বেশে ট্যাংকারকে ক্ষাণিকের জন্য থামিয়ে এই বেল্ট ফিট করে পাহাড়ের সুড়ঙ্গে অবস্থিত বিমান বন্দর পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। এবার আমি সাথীদের বললাম, এটা এখনও পরিকল্পনা মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিত না হতে পারব যে, এভাবে মিশন সফল করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কারও কাছে কিছু বলব না।

ভারতে প্রচলিত বাস ট্রাকের ৯০ ভাগই ভারতের তৈরি। যার মডেল সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার তিন চার বছর পর মার্কেটে আসে। এ আশার আলো পাওয়ার পর আমি আবার আমার এক সাথীকে একটি ছেলের সাথে গোরখপুর পাঠালাম। ট্যাংকারের মডেল ও চাকার সংখ্যা জানার জন্য। কয়েকদিন পর তারা ফিরে এসে জানাল যে, ট্যাংকারগুলো মার্সিডিজ মডেলের এবং দশ চাকা বিশিষ্ট। এ তথ্যের আলোকে আমি গ্যারেজের মেকানিককে বললাম, তুমি এই মডেলের দশ চাকা বিশিষ্ট ট্যাংকার তালাশ কর এবং তার নীচে বেল্ট ফিট করার জায়গা খুঁজে বের করবা। মেকানিক ছেলেটি তখনও এমন ট্যাংকারের সন্ধানেই ছিল। এমন সময় আমার দুই নম্বর সাথী দিল্লী মার্সিডিজ শোরুম থেকে বিভিন্ন সাইজের মার্সিডিজের চেসিসের ব্রোসিয়ার নিয়ে এসেছে। ঐ ব্রোসিয়ারে দশ চাকা বিশিষ্ট ট্রাকের চেসিসের ছবিও রয়েছে। এ ব্রোসিয়ার দেখে মেকানিক ছেলে আমাকে

বলল যে, কোম্পানীর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র গাড়ির চেসিসই বিক্রি করে। বাস, ট্রাক ও ট্যাংকারের বডি মালিকরা নিজেদের মন মত তৈরি করে নেয়। চেসিসের সাথে বডিসহ তৈরি গাড়িও মার্কেটে পাওয়া যায়। তবে এগুলোর মূল্য অনেক বেশি পড়ে। বডি চাই কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৈরি করা থাক বা মালিকের পক্ষ থেকে তৈরি করা হোক, গাড়ির চেসিস সব সময় একই থাকে। আমি মনে করলাম যে, এয়ার ফোর্স ওয়ালারা হয়তো কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৈরিকৃত বডিসহই ক্রয় করে থাকে। এতক্ষণে মেকানিক ছেলে দশ চাকা বিশিষ্ট ট্যাংকারের নীচে ঢুকে বেল্ট লাগানোর প্রয়োজনীয় পয়েন্ট নোট করে নিয়েছে। ট্যাংকারের বডি ও চেসিসের মাঝে স্টিলের বিভিন্ন টুকরায় বিভক্ত একটি প্লেট লাগানো থাকে। এই প্লেটের বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র রয়েছে। মেকানিক ছেলে বলল যে, আমি মেশিনে এ রাড় তৈরি করতে পারি যা ছিদ্রে ঢোকানোর পর দুই দিকে ছড়িয়ে যায় এবং প্লেট শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। এই রডের নীচে হুক লাগানোর জন্য মজবুত গোল রিং হবে। যার মধ্যে সহজেই বেল্টের হুক লাগানো যাবে। ছেলেটি কাগজে ড্রয়িং এঁকে আমাকে রডের ব্যবহার পদ্ধতি দেখাল। আমি তার এ পদ্ধতি দেখে মিশন সফলতার জন্য নিশ্চিত হলাম এবং আমি তাকে উত্তম স্টিল দিয়ে বারো পিস রড তৈরি করতে বললাম। সাথে এটাও বললাম যে, একথা খেয়াল করে রড তৈরি করবে যে একে ১২০ কিলো ওজন বহন করতে হবে। আমি একশত বিশ কিলো ওজন এজন্য বলেছি যে, ট্যাংকার চলার সময় ঝাঁকুনির কারণে বেল্টে শয়নকারীর ওজন দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে। একদিকে মেকানিক ছেলেকে আমি রড তৈরি করতে বললাম, অপরদিকে আরিফকে মার্কেটে পাঠালাম রেডিমেট প্যারাসুটের বেল্ট ও হুক ক্রয় করার জন্যে। আরিফ মার্কেট থেকে উভয়টি নিয়ে এল। বেল্টের প্রস্থ হল তিন ইঞ্চি। আমি আরিফকে বললাম, একটিকে অপরটির সাথে ভালোভাবে মিলিয়ে উত্তম সুতা দিয়ে এমনভাবে সেলাই করবে যাতে করে আড়াই মিটার লম্বা ও বার ইঞ্চি চওড়া একটি ও একটি দুই ইঞ্চি বেল্ট তৈরি হয়। এ কাজের দায়িত্ব আরিফ তার স্ত্রী ও নাজিরের মেয়েদেরকে দিল। তারা লেপ তোষক সেলাই করার সুঁই দিয়ে আমার কাঙ্ক্ষিত সাইজে তিনটি বেল্ট তৈরি করল। আমার মাথায় সর্বদা একথা বিদ্যমান রয়েছে যে, মিশন বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুর মধ্য হতে কোন ক্ষুদ্র বস্তুও যেন প্রস্তুতির লিস্ট থেকে বাদ না পড়ে। তাই এ

বেল্ট দেখার পর মনে হলো, এ বেল্টে শয়ন করে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার সময় গাড়ীর ঝাঁকুনিতে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই আমি এক ফিট চওড়া বেল্টের উপর বিমান যাত্রীদের সেফটি বেল্টের মত প্রয়োজনের সময় যাতে বড় ছোট করা যায় এমন বেল্ট লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আরিফ পুরাতন মাল বিক্রিকারীদের নিকট থেকে এ বেল্ট ক্রয় করে নিয়ে এল। আর মেয়ে আনন্দের সাথে এ বেল্টকেও বড় বেল্টের সাথে সেলাই করে দিল। এতদিনে মেকানিক ছেলে কয়েকটি রড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা ছিদ্রে রাখার পর রডের নিম্নাংশে উপর নীচকারী সুইচকে উপরের দিকে উঠানোর সাথে সাথে রডটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্টিলের চাদরের সাথে মিশে যায় এবং সুইচকে নিচের দিকে হেলানোর দ্বারা পূর্বের পজিশনে ফিরে আসে। এই রডের উপর সেফটি লকও লাগানো হয়েছে। রোডের ঝাঁকুনিতে রড যেন আপছে আপছে খুলে নিচে না পড়ে যায়। এখন আমাদের দশ চাকাবিশিষ্ট ট্রাক সন্ধান করার পালা। যে ট্রাকের নিচের প্লেটের ছিদ্রের দূরত্ব দেখে বেল্টকে এমনভাবে কাটা যায়, যাতে করে তিনটি বেল্টই শয়নকারীকে একযোগে বহন করতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে মেকানিক ছেলে আমাদের এ সমস্যার সমাধানও করে দিল। ট্যাংকারের প্লেটের ড্রয়িং তৈরি করে সেই ছিদ্রের উপর চিহ্ন লাগালো যার মধ্যে রড ঢোকাতে হবে এবং বেল্টকে কাঙ্ক্ষিত সাইজে কেটে দিল। আমি আরিফের সহযোগিতায় বর্ণিত সাইজের আরেকটি সেট বেল্ট তৈরি করলাম। এর মধ্যে মেকানিক ছেলে ১২ পিস রড তৈরি করে আমার হাতে দিল।

* * *

এরপর আমি মেকানিক ছেলেকে বললাম যে, যদি সম্ভব হয় তবে এই রড ও বেল্টকে প্র্যাকটিক্যালভাবে ট্রাই করলে ভাল হয়। এ কথার কয়েকদিন পরই ছেলেটি আরিফের কাছে সংবাদ পাঠাল যে, গ্যারেজে আপনাদের চাহিদানুযায়ী ট্যাংকার এসেছে। রাতে ট্রাই করতে পারবেন। আমি সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার একটু গাঢ় হওয়ার পর দুই নম্বর সাথীকে সাথে নিয়ে গ্যারেজে পৌঁছলাম। তারপর মেকানিক ছেলে ও আমার দুই নম্বর সাথী ট্যাংকারের নিচে ঢুকে গেল। আমি গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি। সবেমাত্র মিনিট দুয়েক সময় পার হয়েছে এর মধ্যেই মেকানিক ছেলে গাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে এলো এবং আমাকে তার সাথে ট্যাংকারে উঠে

বসতে বলল। সে নিজে ড্রাইভ শুরু করে ট্যাংকারকে গ্যারেজ থেকে বের করে রোডে নিয়ে এল। ট্যাংকারকে ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার গতিতে চালাল। আসা যাওয়ায় মোট ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আবার গ্যারেজে ফিরে এল। ট্যাংকার গ্যারেজে এসে দাঁড়ানো মাত্রই আমার দুই নম্বর সাথী ট্যাংকারের নীচ থেকে বেরিয়ে এল এবং মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল যে, খুবই নিরাপদ পদ্ধতি। সেফটি বেল্ট লাগানোর কারণে পড়ে যাওয়ার আশংকাও দূর হয়ে গেছে। আমরা খুশিমনে সাথীদের ঘরে পৌঁছলাম এবং আমাদের পরিকল্পিত মিশনের প্রস্তুতির সফলতার কথা অন্য সাথী ও আরিফ নাজিরকে বললাম। আরিফ ও নাজির বিদায় নেয়ার পর দুই নম্বর সাথী আমার হাত ধরে বলল, 'অদ্যাবধি আমি আপনার সকল নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করেছি। কিন্তু আপনি যদি আমাকে এ মিশনে যেতে বাধা দেন তবে আমি পাকিস্তানে ফিরে যাব। এর পূর্বে আপনি আমার সাথে ওয়াদাও করেছেন যে, এ মিশনে আমাকে নিয়ে যাবেন,। তাছাড়া আমি বিদ্যুতের টেকনেশিয়ান এবং ট্রান্সমিটার পর্যন্ত ঠিক করতে পারি। বোমে টাইম সেট করা এবং তাকে বেন্ডজ টেপের সাহায্যে ট্রাকের নীচে ফিট করা আপনার চেয়ে ভাল জানি। এরপর এক সাথীর দিকে ইশারা করে বলল যে, এ কয়দিনে আমি তাকে ট্রান্সমিটার চালানো এবং Code ও Decope ইত্যাদি ভালভাবে শিখিয়েছি। আমার অনুপস্থিতিতে এ কাজ সে ভালভাবেই করতে পারবে। এ মিশনে যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তবে মনে রাখবেন, আমার শাহাদাত মিশন সফল হওয়ার পরই হবে। আমি যাবার সময়ই বোম ট্রাকে ফিট করে ফেলব এবং বোমে এতটুকু সময় হাতে রেখে সময় সেট করব, যাতে করে ট্যাংকার সুড়ঙ্গে যাওয়ার পরপরই বোম ফাটে। শেষ কথা এটাই যে, একে তো এ মিশনের জন্য আমি হলাম উপযুক্ত ব্যক্তি। অপরদিকে আপনি যদি আমার সাথে অবিচার করেন, তবে আমি আল্লাহর সামনে আপনার জামার কলার ধরে দাঁড় করাব।

দুই নম্বর সাথীর দেশপ্রেম, উৎসাহ উদ্দীপনা ও শাহাদাতের প্রেরণার এমন উন্মাদনা আমাকে পেরেশান করে ফেলল। আমরা পাঁচজনই ভারতের হাতে ঢাকার পতনের পর দেশের মায়ায় ও ক্ষতস্থানে মলম লাগানোর জন্যই ভারতে এসেছি এবং আমাদের ধারণাতীত ক্ষতি আমরা আমাদের চির দুশমনের করেছি। আমি এখন পর্যন্ত সংঘটিত কোন মিশনের

সফলতার ক্রেডিট আমার নামে গ্রহণ করিনি। বরং এ সফলতাকে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সুফল নির্ধারণ করেছি। আমরা কোন মিশনই সফল হওয়ার ব্যাপারে ৭০% নিশ্চিত না হয়ে শুরু করিনি। আর এখন আমার দুই নম্বর সাথী কি না একা এ মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য জিদ ধরেছে, যে মিশনে সফলতার নিশ্চয়তা হচ্ছে মাত্র ফিফটি ফিফটি। পক্ষান্তরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ২০%-এর কম। আমি তাকে এ মিশনের সম্ভাবনাময় সকল বিপদের কথা জানালাম। কিন্তু সে আমার কোন কথাই শোনতে রাজি নয়। ফলে আমাকে বাধ্য হতে হল তার জিদ পূরণ করতে। আমি এ মিশন পাকিস্তানের আনন্দের দিন ২৩শে মার্চের পূর্বেই পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাতে করে দেশবাসী আনন্দের দিনের পূর্বেই এ মিশনের সফলতার আনন্দও একসাথে উপভোগ করতে পারে। আমার দুই নম্বর সাথী (যাকে সামনে হাবিব নামে ডাকব)কে বললাম যে, তুমি যেহেতু নাছোড় বান্দা এ মিশনে যাবেই, না গিয়ে ক্ষান্ত হবে না, তবে আর বসে থেকো না। এখন থেকেই বিদ্যুৎগতিতে বেল্টের উপর শয়ন করার প্র্যাক্টিস শুরু করে দাও। তারপর আমি তাকে বেল্টের একটি সেট দিয়ে দিলাম। এ বেল্টকে সে ছাদের কার্নিশে রিং ঝুলিয়ে ট্রাকের নিচের অংশের মত তৈরি করে তাতে লটকিয়ে দিল। সে প্রতিদিন দুইবার এ বেল্টে শুয়ে সাথীদেরকে বলত যে, আমাকে ডানে বামে সামনে পিছে ঝুলাও। তবে এটা চলন্ত ট্যাংকারে পরিণত হবে।

হাবীবকে মিশনে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার দু'দিন পর আমি গ্যারেজে গেলাম। তখন মেকানিক ছেলে (যাকে সামনে থেকে কায়সার নামে ডাকব) আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমরা মিশনে কবে যাচ্ছি? তার একথায় আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এজন্য যে, সাথীদের ছাড়া এ মিশনের কথা আমি কাউকে বলিনি। এমন কি গোরখপুর যে ছেলেরা গেছে তাদেরকেও বলে দিয়েছি যে, এ মিশন বন্ধ। এখন আমাকে কায়সারের জিজ্ঞাসা যে, 'আমরা মিশনে কবে যাচ্ছি?'

আমার কাছে চিন্তার কারণই বটে। আমি কায়সারকে ট্রাই করার জন্য বললাম যে, তোমাকে কে বলেছে যে আমরা মিশনে যাচ্ছি? তখন সে নির্দ্বিধায় বলে ফেলল, আপনাদের প্রস্তুতি ও রড তৈরি করার দ্বারা আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আমরা মিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমি এও জেনেছি যে, ছেলেরা গোরখপুরে গিয়ে অয়েল ট্যাংকার পরিদর্শন করে

এসেছে। যদিও এখন পর্যন্ত মিশন সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলেনি। তবুও আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার মিশন গোরখপুরে। আর এ মিশন বাস্তবায়ন করতে হবে ট্রাক বা অয়েল ট্যাংকারের নীচে বেল্টে শুয়ে। বেল্টে শুয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। রডকে স্টিলের প্লেটের ছিদ্রে সবচেয়ে কম সময়ে সেট করা ও বেল্টকে সেখানে ফিটও আমি করতে পারব। তাছাড়া রিভলভার ও চাকু ব্যবহারেও আমি পটু। এসব দিক খেয়াল করে এ মিশনে যাওয়ার জন্য আমাকে আমি উপযুক্ত মনে করি। তাই আপনার কাছে আবদার, আপনি আমাকে এ মিশনে পাঠাতে কার্পণ্য করবেন না। আমি কায়সারের যুক্তিযুক্ত কথা শোনে মুগ্ধ হয়ে বললাম যে, এ মিশনের জন্য তো অনেক আগে থেকেই আমার সাথীদের একজনকে নির্বাচন করে রেখেছি। আমার কথা শুনে কায়সার বলল, মিশন বাস্তবায়নে যদি একজনের পরিবর্তে দুইজনকে পাঠানো হয় তবে সফলতার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি হবে। কায়সারের এ কথায় আমি খুবই প্রভাবিত হলাম এবং মনে মনে বললাম যে, সে ঠিকই বলেছে। এ মিশনে দুইজন গেলে সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যদি একজন থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয়জন তাকে কভার করতে পারে। অতঃপর ফিরার পথে লড়াই করতে গিয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে। এটা তো এমন মিশন যাতে শুধুমাত্র একবারই রিস্ক নেয়া যাবে। দ্বিতীয়বার যাওয়ার কোন অবকাশই নেই। তাছাড়া কোন মিশনে একা গেলে একাকীত্বের কারণে অনেক সময় সাহস হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে দুইজন গেলে একাকীত্বের অনুভূতি দূর হয়ে যায়। এ সকল বিষয়াদির প্রতি বিবেচনা করে এবং কায়সারের যোগ্যতা ও প্রেরণাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, উভয়কেই মিশনে পাঠাব। এরপর কায়সারকে আমি মিশনের সম্ভাবনাময় বিপদ সম্পর্কে অবহিত করলাম। যদি তার এ প্রেরণা শুধুমাত্র স্কিন ডিপ হয়ে থাকে তাহলে তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে প্রমাণাদির মাধ্যমে আমাকে নির্বাক করে দিল। এর পর আমি কায়সারকে এ মিশনে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করলাম এবং এখন পর্যন্ত আমি বিমান বন্দর সম্পর্কে যে সকল তথ্য পেয়েছি তার আলোকে তাকে ব্রিফ করলাম। আর এখন থেকে দ্রুতগতিতে বেল্টে শয়নের প্র্যাকটিস শুরু করতে বললাম। এর পরের দিন আমি কায়সারের কাছে বেল্টের আরেকটি সেট পাঠিয়ে দিলাম।

* * *

আমি এ মিশনে হাবীব ছাড়াও আমার আরেক সাথী এবং কায়সারসহ মোট চারজন ছেলেকে আমার সাথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। ঠিক এ সময়ে পাকিস্তানে প্রেরিত ডাকে আমি পত্র লিখে পাঠালাম যে, আমরা একটি মিশনের ট্রাই করতে যাচ্ছি। সম্ভব হলে ট্রাইয়ের মধ্যে মিশন সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। এ মিশনে হাবীব ছাড়াও আরেক সাথী আমার সাথে যাচ্ছে। ডাকের আদান-প্রদান সম্পর্কে আমার বাকী দুই সাথী কিছুই জানে না এবং কুরিয়ারও তাদের চেহারা চিনে না। অতএব, আমরা মিশন থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ডাকের ধারাবাহিকতা বন্ধ রাখতে হবে। আমরা ফিরে আসার পর বুধ অথবা রবিবার দিনের সকাল দশটার দিকে O.K. সিগন্যাল দিব। এ সিগন্যালের পর নির্ধারিত দিন ও সময়ে ডাকের ক্রমধারা পুনরায় আবার শুরু করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত যত মিশন আমরা বাস্তবায়ন করেছি এই মিশনে তারচেয়ে বেশি মানুষের দল আমি আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। এর পিছনে কারণ হচ্ছে এই যে, এখন পর্যন্ত মিশনের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। আমি চাচ্ছি, প্রয়োজন সাপেক্ষে আমি যেন লোকের স্বল্পতার শিকার না হই। আমাদের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আমরা ১৯৭৪ সনের ৬ই মার্চ গোরখপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের সাথে ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনীয় সামানা ছাড়াও ছয়টি টাইম বোম এবং আটটি পিস্তল ও শত শত গুলি রয়েছে। গোরখপুরে পৌঁছে আমি একজন সাথী এবং ছেলেদের একই দিনের বিভিন্ন সময়ে একই হোটেলে উঠালাম। আর হাবীব ও কায়সার আমার সাথে আমার হোটেলেই কামরা ভাড়া করল।

পরদিন সকাল বেলাই আমরা পেট্রোল ট্যাংকের সন্ধান শুরু করলাম। যাতে করে এয়ার ফোর্সের অয়েল ট্যাংকারের সন্ধান পেতে পারি। এতদিন পর্যন্ত অর্জিত তথ্যে আমি একথার উপর নিশ্চিত হয়েছি যে, অয়েল ট্যাংকার থেকে ডাইরেক্ট জাহাজে পেট্রোল ঢালা হয় না। অতএব সুড়ঙ্গে অবশ্যই এয়ার ফোর্সের পার্সোনাল ট্যাংক আছে যেখানে অয়েল ট্যাংকারের পেট্রোল জমা রাখা হয়। তার ট্যাংক থেকে জাহাজে পেট্রোল সাপ্লাই করা হয়। অয়েল ট্যাংকার তার লোডকৃত পেট্রোল এয়ার ফোর্সের ট্যাংক ডেলিভারী করে পুনরায় পার্কিং এ ফিরে আসে। তিন চার দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের ও অপেক্ষার পর আমরা এয়ার ফোর্সের একটি অয়েল ট্যাংকার

দেখতে পেলাম। পেট্রোল লোড করতে আনুমানিক আধা ঘণ্টা সময় ব্যয় হল। ট্যাংকারে ড্রাইভার ছাড়াও একজন ক্লিনার ও একজন সশস্ত্র গার্ড রয়েছে।

এই তিনজন পেট্রোল লোড করার সময় ট্যাংকার থেকে বের হয়ে পেট্রোল ট্যাংকের নিকটেই নির্মিত একটি মন্দিরে বসে গেল। পেট্রোল ভরার সময় হাবীব ও কায়সার ট্যাংকারের নীচে ঢুকতে পারল না। ফিরার পথে রোড মেরামতকারীদের বেশে ও আমরা ট্যাংকারকে কয়েক মিনিটের জন্য থামাতে পারি। তবে এ কাজ রোড মেরামতের হেভী মেশিন পত্র ছাড়া সম্ভব নয়। আর যদি আমরা রোডে ট্যাংকার আনিয়ে ড্রাইভার, ক্লিনার ও গার্ডকে হত্যা করে তাদের উর্দি পরে ট্যাংকার নিয়ে যাই তবে প্রথম চেকপোস্টেই ধরা খাব। আর কোনক্রমে যদি চেকপোস্ট পাড়ি দিতেও পারি তারপরও তো সমস্যা মুক্ত নয়। কেননা আমরা জানি না যে এয়ার ফোর্সের ট্যাংক কোথায় এবং কিভাবে সেখানে যেতে হয়। মোটকথা, সর্বাবস্থায় আমাদের ধরা খাওয়া নিশ্চিত। এয়ার ফোর্সের ট্যাংকার সপ্তাহান্তে মাত্র এক দুইবার পেট্রোল নিতে আসে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না যে, অয়েল ট্যাংকার পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছবো। এ ভাবনাতে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু তারপরও আমরা এ সমস্যার কোন সমাধান বের করতে সক্ষম হলাম না।

এক সন্ধ্যায় আমরা এক রেস্টুরেন্টে বসে আছি। এমন সময় আমাদের এক ছেলে বলল যে, আমি অনুসন্ধানকালে দেখেছি, পেট্রোল ডিপো যে চার দেয়ালে বেষ্টিত তার তিনটি বড় বড় গেইট রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় গেইটে রেল লাইন বিছানো। এর পাশে একটি গেইট রয়েছে শ্রমিকদের জন্য। তৃতীয় বড় গেইট দিয়ে ট্যাংকার আসা যাওয়া করে। আর চারটি গেইটই তালা দেয়া থাকে এবং ট্যাংকারের জন্য নির্ধারিত গেইটে একজন পাহারাদার থাকে। আর এ পাহারাদার ট্যাংকারের ড্রাইভারের পরিচয় জানার জন্য দুই চার মিনিটের জন্য ট্যাংকরকে গেইটের বাইরে থামিয়ে রাখে এবং পরিচয় জানার পর তালা খুলে ট্যাংকারকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। এ দু'চার মিনিটের বিরতি হাবীব ও কায়সারের জন্য খুবই কম সময়। তাদের জন্য কমপক্ষে দশ মিনিটের প্রয়োজন। এই ছেলে আরও বলল, যদি একটি ছেলে আমার সাথে দেন তাহলে আমি ট্যাংকটাকে দশ মিনিটের পরিবর্তে পনের বিশ মিনিট পর্যন্ত থামাতে

পারব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, কিভাবে? জবাবে সে বলল, আমাদের এক সাথী যদি দূরত্ব বজায় রেখে রোডে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দূর থেকে ট্যাংকার দেখামাত্র যদি আমাকে ইশারা করে তবে আমি ও আমার সাথী তখনই পাহারাদারের কাছে চলে যাব। সাথী পাহারাদারকে কথাবার্তায় লিপ্ত করে তার পাশে এভাবে দাঁড়াবে যাতে করে পাহারাদার গেইট দেখতে না পারে। ততক্ষণে আমি দৌড়ে গিয়ে তালার মধ্যে সামান্য ইলফি ঢেলে দিয়েই আমরা ওখান থেকে চলে আসব। ট্যাংকার গেইটে পৌঁছার পর পাহারাদার গেইট খুলতে ব্যর্থ হবে। এমতাবস্থায় ট্যাংকারে বসা লোকজন যদি ট্যাংকার থেকে নীচে নেমে আসে তবুও তাদের খেয়াল তালা ও গেটেই নিবদ্ধ থাকবে। আর এই ফাঁকে হাবীব ও কায়সার ট্যাংকারের নীচে গিয়ে তাদের কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। এই পন্থা যদিও নিরাপদ নয় তথাপি এছাড়া অন্য কোন পথও আমাদের কাছে নেই। তাই সকলেই এ পদ্ধতিতেই কাজ করার জন্য একযোগে মত প্রকাশ করল।

দিল্লী থেকে আসার পূর্বেই আমি আরিফের মাধ্যমে শ্লেটের কালারের দুটি ওভার অল হাবীব ও কায়সারের জন্য তৈরি করেছি এবং এর পিছনে এয়ার ফোর্সের বিশেষ বৃত্তের বিশেষ প্রতীক তৈরি করেছি। এরপরও সমস্যা হল হাবীব ও কায়সার বোম অন করে সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে এয়ার ফোর্সের সংরক্ষিত এরিয়া নিরাপদে পাড়ি দিবে। এর দুটি পথ হতে পারে। একটি হচ্ছে এই যে, ধামাকার পর সেখানে যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যাবে তখন এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা উভয়ে কোন ট্রাক বা জিপ নিয়ে যে পথে গেছে সে পথে ফিরে আসবে। হট্টগোল অবস্থায় প্রথম দুই এক ঘণ্টা কঠিন নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এলোমেলো হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত যে, সুড়ঙ্গের ভিতরে অয়েল ডিপো ছাড়াও এয়ার ফোর্সের আর্সেনাল অস্ত্রের গোডাউনও থাকবে। সুড়ঙ্গে আমাদের বোমের ধামাকায় যদি তেলের ডিপোতে আগুন ধরে যায় তবে আর্সেনাল-এর মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠবে। আর এ আগুনের জ্বলনে জাহাজ তো জ্বলেপুড়ে ছাই হবে। তাছাড়া সুড়ঙ্গে অস্ত্রাগারে আগুন ধরে যাওয়ার কারণে ধামাকার তীব্রতাও শুধুমাত্র সুড়ঙ্গের চারদিকেই হবে। ফলে সুড়ঙ্গের কোন প্রাণীই বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এ কারণেই হাবীব ও কায়সারকে বোমা ফাটার পূর্বেই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা অত্যাবশ্যকীয়। আর দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এই যে, উভয়কেই সুড়ঙ্গ

থেকে বের হয়ে পাহাড়ে উঠে যেতে হবে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে পথ ঘুরে গোরখপুরে পৌঁছতে হবে। আর এই দুই পথেই তাদের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। এ সকল ভয়াবহতা ও বিপদের কথা আমি তাদের কাছে গোপন করিনি। গোরখপুরে এসেও তাদেরকে এ বিপদাপদ সম্পর্কে অবহিত করেছি। কিন্তু আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ সতর্কবাণীতে তাদের মিশনে অংশগ্রহণের আগ্রহ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে সঙ্গে করে উত্তর প্রদেশের একটি মানচিত্র নিয়েছিলাম। সেই মানচিত্রে দেখলাম, গোরখপুর থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তরে মহেন্দওয়াল এবং ৪৫ কিলোমিটার দূরে পুদরাওনা এবং ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে দেউরিয়া প্রদেশ অবস্থিত। আর এসব এলাকাই হচ্ছে উঁচু নীচু পাহাড়ে ঘেরা দুর্গম পাহাড়ী এলাকা।

গোরখপুরের সর্বশেষ হেদায়েত স্বরূপ আমি তাদেরকে বললাম, সুড়ঙ্গ থেকে রোড হয়ে ফিরে আসতে যদি সমস্যা হয় তবে পাহাড়ী পথ ধরবে। এ পথে নিকটবর্তী কোন প্রদেশে উঠার চেষ্টা করবে। আর যখন পাহাড়ী পথে চলবে তখন ওভার অল গা থেকে খুলে জঙ্গলে ছুঁড়ে মারবে। যদি কেউ তোমাদের দেখে ফেলে তাহলে তারা যেন তোমাদের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করতে না পারে। আর শোন, সুড়ঙ্গের বাইরে অবশ্যই কোন জিপ বা ট্রাক থাকবে। তোমরা সেই ট্রাক বা জিপ নিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। এতে যদি কেউ বাধ সাধে সাথে সাথে তাকে হত্যা করবে। গাড়ি নিয়ে ফিরার পথে চেকপোস্টে যদি তোমাদের ঠেকাতে চেষ্টা করে, তবে একজন গাড়ির গতি বাড়িয়ে Barriers ভেঙ্গে গাড়ি সামনে এগিয়ে নিবে। অপরজন গার্ডের প্রতি গুলি ছুঁড়বে। আর আমি আমার সাথে দুইজন ছেলে নিয়ে যতখানি সম্ভব অগ্রসর হয়ে এই রোডে একটি প্রাইভেট কার নিয়ে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। আর অপারেশনের পূর্বে সকলেই সমস্ত সরঞ্জামাদি গুছিয়ে রেখো। অপারেশনের পরপরই বিদ্যুৎবেগে আমাদেরকে গোরখপুর ছাড়তে হবে। মোটকথা, আমাদের প্রোগ্রামের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পরদিন সকাল থেকেই মিশন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিলাম।

হাবীব এবং কায়সার ওভার অল এবং বোম একটি ব্যাগে ভরে অয়েল ট্যাংকের কাছাকাছি একটি নিরাপদ স্থানে অবস্থা নিল। আর পাহারাদারের কাছে গমনকারী ছেলেদ্বয়ও রেল লাইনেরই পাশে এমন স্থানে অবস্থান নিল যেখান থেকে ট্যাংকার আগমনের সংকেত প্রদানকারী ছেলেকে স্পষ্ট দেখা

যায়। প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা সকলে প্রত্যেক দিন হোটেলের বিল পরিশোধ করে হাবীব ও কায়সারের সামানা আমার কামরায় আর বাকী সাথীরা একজন ছেলের কামরায় রেখে দিব। যাতে করে হোটেল ছাড়তে সময় নষ্ট না হয়। আর মিশন শেষে হাবীব ও কায়সারকে নিয়ে আসার জন্য প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা আমরা এভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, হাবীব ও কায়সার যখনই ট্যাংকারের সাথে রওনা হবে আমরা তখনই শহরে চলাচলকারী গাড়ির মধ্য হতে উত্তম কোয়ালিটির এমন গাড়ি থামাব যার যাত্রী থাকবে একজন। ড্রাইভারসহ এই গাড়ি আমরা ছিনতাই করব। এ সময় আমার সাথী হোটেল থেকে তাদের ও আমার সামানা নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হবে। তার আসার পরপরই আমরা তাকে নিয়ে ড্রাইভারসহ আরেকটি প্রাইভেট কার ছিনতাই করব। তারপর ছিনতাইকৃত গাড়ি দুটি নিয়ে সুড়ঙ্গে যাতায়াতের পথে রওয়ানা হব এবং চেকপোস্টের পূর্বে হাবীব ও কায়সারের জন্য অপেক্ষা করব। আর উভয় গাড়ির মালিক বা ড্রাইভারকে নীরব স্থানে ছেলেরা খঞ্জর মেরে হত্যা করবে। আপনারা হয়তো আমাদের এই কাজকে হিংস্র আচরণ বলতে পারেন। তবুও এ পথ ছাড়া আমাদের আর বিকল্প কোন পথ নেই। যদি আমরা তাদেরকে ঘুষি মেরে বেহুশ করে দিই তবে জ্ঞান ফিরার পরপরই তারা আমাদের অবয়ব আকৃতি সরকারকে বলে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই আমাদেরকে এ পথ নির্বাচন করতে হয়েছে। আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছি। আর এমতাবস্থায় Kill your enemy before he kills you -এর কথা মতো কাজ করতে হবে। আমাদের দুইজন জানবাজ এই বিপজ্জনক মিশনে জীবন বাজি রেখেছে। তাদের যাত্রার পরপরই আমাদেরকে গাড়ি ছিনতাই করতে হবে। এই জানবাজদ্বয়ের জীবন রক্ষা করার জন্য যদি শত শত মানুষের জীবনও হরণ করতে হয় তাতেও আমরা প্রস্তুত।

২০ শে মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন আমরা সকাল আটটা থেকে বিকাল ছয়টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে বসে ট্যাংকার আগমনের অপেক্ষা করতে থাকলাম। ২১ শে মার্চ সকাল সাড়ে নয়টায় মেইন রোডে দাঁড়ানো ছেলে ট্যাংকার আগমনের অপেক্ষায় ছিল। সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই ছেলে দুটি বাজপাখির ন্যায় দৌড়ে গেইটের পাহারাদারের কাছে গেল। একজন পাহারাদারকে ট্যাংকের ইনচার্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে কথায়

নিয়োজিত করল। অপরজন দ্রুততার সাথে তালার মধ্যে ইলফি ঢেলে দিল। এসব কাজ করতে বড়জোর দেড় মিনিট লেগেছে। তারপর তারা দু'জনই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে তাদের পূর্বের স্থানে ফিরে গেল। এর কয়েক মিনিট পরেই ট্যাংকার গেইটে এসে হাজির হল। পাহারাদার নিয়মানুযায়ী ট্যাংকার ড্রাইভারের পরিচয় পর্ব শেষ করে গেইট খুলতে চাইল। তালায় ইলফি থাকার কারণে খুলতে পারল না। পাহারাদার তালা খুলার জন্য শক্তি ব্যয় করতে শুরু করল।

এ বিরতিই আমাদের কাম্য ছিল। তাই হাবীব ও কায়সার বোম ও ওভার অলের থলে নিজেদের বুকে বেঁধে নিয়েছে নীরবে সন্তর্পণে। তবে দ্রুতগতিতে ট্যাংকারের দিকে এগিয়ে গেল। গেইট খুলতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ট্যাংকারের ড্রাইভার গার্ড ও ক্লিনার নীচে নেমে এল। ইলফি যেহেতু একটু পূর্বে ঢালা হয়েছে তাই জোরেসোরে কয়েকটি ঝটকা দিয়ে ড্রাইভার তালা খুলে দিল। ফটক খুলে যাওয়ার পর ট্যাংকার ভিতরে প্রবেশ করল এবং একটি ট্যাংক থেকে তার তেল ভরা হল। আমরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে এসব কাজ দেখছিলাম। তেল ভরা শেষ হলে ট্যাংকার ফিরে যেতে লাগল। এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটিত সকল কাজ আমাদের চাহিদানুযায়ীই হয়েছে বিধায় আমরা দৌড়ে বেবী স্ট্যান্ডে গেলাম। সেখান থেকে দুইটি স্কুটার নিয়ে দুই ছেলে দুই হোটেলে চলে গেল আমাদের সামানা আনার জন্য। রওনা দিবার পূর্বে আমি তাদের বলে দিলাম মিটিং পয়েন্ট।

তারা চলে যাওয়ার পর বাকি থাকলাম মাত্র আমরা তিনজন। আমরা শহরের পাশেই অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার দিকে যাত্রা করলাম। এখান থেকে আমাদেরকে গাড়ি সংগ্রহ করতে হবে। কয়েকটি গাড়ি দেখার পর আমরা এমন একটি গাড়ি দেখলাম যাতে মাত্র একজন লোক রয়েছে। আমি রোডের মাঝখানে এসে তাকে থামালাম। গাড়ির গ্লাস লাগানো ছিল। আর পিস্তলও আমার পকেটেই আছে। আমি তাকে কিছু বলার জন্য ঠোঁট নাড়াচাড়া করলাম। কিছু না বুঝার কারণে সে গ্লাস নীচে নামাল। এর মধ্যে আমি পকেট থেকে পিস্তল বের করে তার ঘাড়ে ঠেকিয়ে ধরলাম। ড্রাইভারের এসবই হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত। যার কারণে সে হতবম্ভ হয়ে গেল। এই ফাঁকে আমি দরজা খুলে গাড়িতে উঠে তার পাশের সিটে বসে গেলাম এবং আমি নিজে স্টিয়ারিং সামলে নিলাম। আমাকে স্টিয়ারিং-এ দেখামাত্র ছেলে দুইটি আড়াল থেকে বের হয়ে গাড়ির পিছনের সিটে উঠে বসল।

আমি গাড়ি চালাতে লাগলাম। এমন সময় ছেলেরা ড্রাইভারকে টেনে নিয়ে পিছনের সিটের পা রাখার স্থানে শুইয়ে দিল। একটি ছেলে রিভলবার তার কানপট্টিতে লাগিয়ে বলল, যদি একটু নড়াচড়া কর বা চিৎকার কর তবে গুলি করব। আমি গাড়ি নিয়ে মিটিং পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম এবং গাড়ি থেকে বের হয়ে হোটেল গমনকারী ছেলেদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকলাম। বিশ মিনিটের মধ্যে ছেলে দুটি ফিরে এল এবং গাড়ি থেকে কিছুদূরে সামানা নামিয়ে স্কুটার বিদায় করে দিল। আমি গাড়ি তাদের কাছে নিয়ে গেলাম। তারা তাড়াহুড়া করে সামানা গাড়ির ডগে রাখল।

তারপর আমরা দ্বিতীয় গাড়ির সন্ধানে বের হলাম এবং রেলওয়ে অফিসের দিকে যাত্রা করলাম। মেইন গেইটের বাইরেই গাড়ি পার্ক করে আমরা দুইজন অফিসের সীমানায় ঢুকে পড়লাম। গোরখপুর বড় জংশন হওয়ার কারণে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভীড়। আমরা অফিসের কার পার্কিং-এ চলে গেলাম। রিজার্ভেশনের লোকেরা সেখানে আসছে। পার্কিং-এ সাত আটটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ইচ্ছা করলে গাড়ি চুরিও করতে পারতাম। তবে চুরির সংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে এবং একটু পরই গাড়ির সন্ধানও শুরু হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা ড্রাইভারসহ গাড়ি ছিনতাই করতে চাচ্ছি। স্যুটকোট পরিহিত এক ভদ্রলোক রিজার্ভেশন অফিস থেকে বেরিয়ে এল এবং একটি নতুন গাড়ির দিকে যেতে লাগল। সে গাড়ির কাছে পৌঁছে সবেমাত্র গাড়ির দরজা খুলেছে, এমন সময় আমি পিস্তল তার ঘাড়ে ঠেকিয়ে ভিতরে ঠেলে দিলাম। তারপর পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথার পিছন দিকে সজোরে আঘাত করলাম। আঘাত খেয়ে সে জ্ঞান হারাল। ততক্ষণে আমার সাথীরা পিছনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে তাকেও পিছের সিটের পাদানীর কাছে শুইয়ে দিল। আমি গাড়ি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার সাথীও গাড়ি চালাতে দক্ষ হওয়ায় আমি তাকে অপর গাড়ি চালাতে বললাম এবং এও বললাম যে, ঐ গাড়ির ড্রাইভারের মাথাতে পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেল। তাহলে তার পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টতার আশংকা আর বাকি থাকবে না।

আমরা মোট সাতজন গোরখপুরে এসেছি। হাবীব ও কায়সার ছাড়া বাকি আছি আমরা পাঁচজন। আর এ পাঁচজন আমরা দুই গাড়িতে ভাগ হয়ে বসলাম। আমার গাড়ির পিছের সিটে এক ছেলে বসল। আর আমার

সাথীর গাড়ির পিছের সিটে দুই ছেলে বসল। তারপর আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে গাড়ি বিমান বন্দর রোডে ছুটালাম। আমি একথা স্বীকার করতে কখনও কার্পণ্য করব না যে, এটা আমার জীবনের প্রথম মিশন যাতে আমি এ্যাকশন গ্রুপের সদস্য নই। তারপরও আমার অবস্থা এই হয়েছে যে, আমার অনুভূতিশক্তি লোপ পেয়েছে। যার কারণে আমি পূর্ব নির্ধারিত প্লান অনুযায়ী শুধুমাত্র একজন রোবটের মত কাজ করে যাচ্ছি। আর আমার সাথী ও ছেলেদের অবস্থাও আমার চেয়ে ভিন্ন নয়। এছাড়া এটাই আমাদের প্রথম মিশন যাতে আমরা অপারেশনের স্থান ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানি না। তারপর আবার অপারেশন শেষে হাবীব ও কায়সারের নিরাপদে ফিরে আসার চান্সও কম। আর এ প্লানিংয়ের পুরো দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। তাছাড়া এ মিশনের জন্য আমার সিনিয়র থেকে অনুমতিও নেইনি। এত ত্রুটির পরও হাবীব ও কায়সার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। হাবীব ও কায়সার যদি অপারেশন শেষে নিরাপদে ফিরে আসে তবে এতে বিন্দুমাত্রও আমার কৃতিত্ব নেই। তা হবে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ ও অসীম করুণা।

এ অপারেশনের জন্য আমার মন আমাকে পীড়া দিচ্ছে এই বলে যে, তুমি নিজেকে হিরো বানানোর জন্য হাবীব ও কায়সারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। তাছাড়াও আমি অনুভব করতে সক্ষম হলাম যে, সত্যিই আমি তড়িঘড়ি করে একটি ভুল ও অরক্ষিত প্লান করেছি। এসকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আমার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল। তাই আমি মনে মনে ভাবলাম, এই অনুভূতি যদি সকালে হত তবে হাবীব আর কায়সারকে মিশনে যাওয়া থেকে বিরত রাখতাম। কিন্তু ভেবে আর লাভ কি। তীর তো কামান থেকে ছুটে গেছে। তাই আল্লাহর রহমতই হচ্ছে আমার একমাত্র আশা ভরসা। আমাদের সকলের অনুভূতি এক হওয়ায় কেউ কোন কথা বলছে না। তাই আমি নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম, আমাদের বন্দি মাথায় আঘাত খেয়ে বেহুঁশ হয়েছে দু'ঘণ্টা হয়। এখন হয়তো জ্ঞান ফিরতে পারে। তাই তার মাথায় পুনরায় আঘাত করলে আর জ্ঞান ফিরবে না।

এই কঠিন মুহূর্তে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, হাবীব আর কায়সার যদি নিরাপদে ফিরে আসে তবে আল্লাহর রহমতের কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে নফল নামায পড়ব। আর বন্দিদের হত্যা করার পরিবর্তে মাথায় আঘাত করে

চার পাঁচ ঘণ্টার জন্য বেহুঁশ করে ফেলব। ততক্ষণে আমরা গোরখপুর থেকে বহু দূরে চলে যাব। আর ফিরে যাওয়ার জন্য প্লান করলাম যে, আমরা রাজপথে প্রথমে খলিল আবাদ তারপর ফয়েজ আবাদ যাব। তারপর ফয়েজ আবাদ থেকে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ, আর লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী।

অপেক্ষার প্রহর কাটানো আমাদের জন্য খুবই কষ্ট হল। প্রতিটি মিনিট মনে হতে লাগল যে এটা মিনিট নয় বরং একটা বছর। হাবীব ও কায়সার মিশনে গেছে তিন ঘণ্টা হবে হয়তো। এমন সময় জমিন কেঁপে উঠল। এখনও জমিনে কম্পন থামেনি, পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশের দিকে উঠতে দেখলাম। এরপরই কানের পর্দা বিদীর্ণকারী বিকট শব্দের ধারাবাহিকতা শুরু হল। ধীরে ধীরে আগুনের কুণ্ডলী ও ধামাকার তীব্রতা বৃদ্ধি হতে লাগল। আগুনের কুণ্ডলি এত উপরে উঠেছে যে, আমরা পাহাড়ের অপর পাশে থাকা সত্ত্বেও আগুন স্পষ্ট দেখলাম। থেমে থেমে ধামাকার তীব্রতা থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, সুড়ঙ্গে নির্মিত অস্ত্রাগারেও আগুন ধরেছে। আর আগুনে অস্ত্রাগারে রাখা বোম, রকেট ও অন্যান্য অস্ত্র ফোটার কারণে ধামাকা তীব্র হচ্ছে। আমরা দূর থেকে যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখেছি নিশ্চিত যে, এ আগুন সুড়ঙ্গের মুখ থেকেই বের হচ্ছে। কেননা সুড়ঙ্গের মুখ ছাড়া আগুন বের হওয়ার আর কোন বিকল্প পথ নেই। মিশন আমাদের ধারণাতীত সফল হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিন্দুমাত্র আনন্দিত নই। আমরা শুধু হাবীব ও কায়সারের নিরাপত্তা কামনা করে আল্লাহর কাছে দুআ করছি।

অগ্নিশিখার ঊর্ধ্বগতি ও ধামাকার ক্রমধারা অব্যাহত আছে, এমন সময় এয়ার ফোর্সের একটি ট্রাক সুড়ঙ্গের দিক থেকে আসতে দেখলাম। এ ট্রাকের আগমন দেখে আমরা গাড়ি স্টার্ট করলাম। আর দুইজন ছেলে এই রোডের ঢালুতে দাঁড়িয়ে গেল। উল্কার গতিতে ট্রাক আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। ট্রাক আমাদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র ছেলেরা ট্রাকের ড্রাইভার ও তার পাশে বসা যাত্রীকে চিনে ফেলল। পরক্ষণেই তারা না'রা লাগিয়ে রোডের মাঝে এসে ট্রাক থামানোর জন্য সিগন্যাল দিতে লাগল। ট্রাক থামার পর হাবীব ও কায়সার ট্রাক থেকে নিচে নেমে এল। আমি সাথীকে বললাম, ট্রাকের এক্সলেটারে পাথর রেখে ট্রাক স্টার্ট করে স্টেয়ারিং ঘুরিয়ে ট্রাককে রোডের ঢালুর দিকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। হাবীব ও কায়সার

এখনও আমাদের সাথে কোন কথা বলেনি। তাছাড়া আমরাও চেতনা ফিরে পাইনি।

* * *

ট্রাক হেলতে দুলতে রোড থেকে ৫০ ফিট নিচে খাদে গিয়ে পড়ল। খাদে পড়ার সময়ই তাতে আগুন লেগে গেল। এ সময় ছেলেরা বেহুঁশ ড্রাইভার দুইজনকে গাড়ি থেকে টেনে নামাল। তারপর এক ছেলে সবেমাত্র খঞ্জর বের করেছে তখনই আমি তা দেখে চিৎকার করে তাকে নিষেধ করলাম তাদেরকে হত্যা করতে। আমার কথা মত তাদেরকে টেনে রোডের ঢালে এক পাথরের পিছে নিয়ে গেল। আমি নিজে সেখানে গিয়ে তাদের মাথায় পিস্তলের হাতল দিয়ে কয়েকটি আঘাত করলাম। আমার ধারণা যে, চার পাঁচ ঘণ্টার আগে তারা জ্ঞান ফিরে পাবে না। তারপর কায়সার আমার সাথে আর হাবীব আমার সাথীর গাড়িতে বসল। আমরা গাড়ি গোরখপুরের দিকে ছুটালাম এবং শহরে প্রবেশের পূর্বেই গাড়ি খলিলে আবাদের রোডে তুফান বেগে চালালাম। রোড ভাঙ্গাচোরা থাকার কারণে বহু কষ্টে আমরা এক ঘণ্টায় খলিল আবাদ পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমরা পাম্প থেকে উভয় গাড়িতে পেট্রোল ভরলাম। তারপর পানি ও মবিল চেক করলাম। এরপর গাড়ি ফয়েজ আবাদের উদ্দেশে ছুটালাম। খলিল আবাদ থেকে ফয়েজ আবাদ পৌঁছতে আমাদের ৫ ঘণ্টা সময় লাগল। রোড জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা থাকার কারণে গাড়ি দ্রুত চালানোর পরও এ দীর্ঘ সময় লেগেছে। ফয়েজ আবাদ শহরে পৌঁছার পূর্বেই আমরা এক নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামিয়ে আমাদের সামানা বের করলাম। আমার সাথী ঢালুতে ট্রাক ফেলানোর সময় ট্রাক থেকে ডিজেল ভর্তি ক্যান বের করে অর্ধেক ক্যান ট্রাকে ফেলেছে আর অর্ধেক সাথে নিয়ে এসেছে। আর এই অবশিষ্ট ডিজেল আমরা উভয় গাড়িতে ঢেলে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে ফয়েজ আবাদ শহরে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে স্কুটার নিয়ে আমরা রেল স্টেশনে গেলাম।

আমি সাথীকে বললাম স্টেশন পর্যবেক্ষণ করার জন্য। সে পর্যবেক্ষণ করে এসে বলল, অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা নেই। তার রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা দুইজন দুইজন করে লক্ষ্ণৌ-এর টিকেট কাটলাম। তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর লক্ষ্ণৌ-এর ট্রেন এলো। আমরা সকলেই এক বগিতে উঠে বসলাম। তার পূর্বে আমি সবাইকে বললাম, প্রত্যেকের পিস্তল লোড করে

রাখার জন্য। মিশন সফল হয়েছে। তারপর আবার হাবীব ও কায়সার নিরাপদে ফিরে এসেছে। তাই এখন আমরা কোন প্রকারের রিস্ক নিতে প্রস্তুত নই।

ট্রেন ছাড়ার পর আমরা গোরখপুরে তৈরিকৃত সেন্ডউইচ খেলাম। ফয়েজ আবাদ থেকে লক্ষ্ণৌর দূরত্ব হল ১২৫ কিলোমিটার। এই প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৫ ঘণ্টায় এ পথ পাড়ি দিয়ে লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় শেষের দিকে। স্টেশন থেকে জানতে পারলাম যে, দিল্লীর ট্রেন সকাল আটটায় আসবে। আমরা রাতের বাকি সময় স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর স্টেশন থেকে চা কেক এনে কোন মতে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। সকাল আটটায় আমরা দিল্লীর ট্রেনে উঠে বসলাম এবং সন্ধ্যায় গিয়ে দিল্লী পৌঁছলাম। গোরখপুর থেকে দিল্লী পৌঁছা পর্যন্ত আমরা আমাদের দুঃসাহসী হাবীব ও কায়সারের কাছে মিশন সম্পর্কে কোন কথা বলিনি। তারপরও দিল্লী স্টেশন থেকেই আমি তিন ছেলেকে বিদায় জানালাম। আর কায়সারকে সাথে করে সাথীদের বাসায় পৌঁছলাম। এ রাতও আমরা নীরবে কাটালাম। শত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি হাবীব ও কায়সারের কাছে এ মিশন সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমি জানি যে, টেনশনের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। পরদিন সকালের নাস্তার পর আমি তাদেরকে আমার কামরায় ডাকলাম। আমার সাথীরাও সেখানে এল। আমি হাবীব ও কায়সারকে যথাযথভাবে মিশন সফল করা ও জীবিত ফিরে আসার কারণে হৃদয়ের গভীর থেকে মোবারকবাদ জানালাম। আমার সাথীরাও আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাদেরকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরল। ততক্ষণে আরিফ ও নাজির আমার কামরায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি হাবীব ও কায়সারকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এখন বিস্তারিত বল যে, ট্যাংকারের নিচে শয়ন করার পর থেকে নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত তোমাদের উপর কেমন ঝড় বয়েছে আর বিপজ্জনক মিশন কিভাবে সফল করেছ?

* * *

এই লোমহর্ষক অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ বলার জন্য হাবীব বলতে শুরু করলো– গেইটে ট্যাংকার পৌঁছামাত্র কায়সার এবং আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ট্যাংকারের নীচে ঢুকে গেলাম। কায়সার তো তখনই ট্যাংকারের নিচে লাগানো স্টিলের প্লেটের ছিদ্র খুঁজে বের করে তার

মধ্যে রড ঢুকিয়ে তার বেল্ট ফিট করে ফেলল। আমার ছিদ্র খুঁজতে একটু বিলম্ব হল। কায়সার আমাকে সাহায্য করল এবং যুৎসই ছিদ্রে আমার রড ঢুকিয়ে তাতে আমার বেল্ট ফিট করে দিল। আমাদের বেল্ট ফিট করার কয়েক সেকেন্ড পরই গেইট খোলার আওয়াজ পেলাম। তারপরই ট্যাংকার চলতে শুরু করলো। তেল ট্যাংক-এর কাছে গিয়ে ট্যাংকার থেমে গেল। ট্যাংকারে তেল ভরতে আনুমানিক আধা ঘণ্টা সময় ব্যয় হল। এই আধা ঘণ্টা সময়ের প্রথম কয়েক মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, ট্যাংকারের নিচে আমাদের অবস্থা কেউ লক্ষ্য করেনি। তারপর যখন তেল ভরা শুরু হল তখন আমরা বেল্টে শুয়েই ওভার অল পরিধান করে ফেললাম। তারপর আমরা দু'জনই থলে থেকে দু'টি বোম বের করে ট্যাংকারের প্লেটে বেন্ডেজ টেপ দিয়ে মজবুত করে আটকালাম। যাতে করে ট্যাংকার চলার সময় ঝাঁকুনিতে বোম নিচে না পড়ে। এখন আমাদের বাকি থাকল শুধুমাত্র বোমে টাইম সেট করা। যা আমরা গন্তব্যে পৌঁছার পরও করতে পারব। সেফটি বেল্ট থাকার কারণে আমরা গাড়ি চলার সময় যে ঝাঁকুনি হয় সে সময় নিচে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে গেলাম। এখন আমাদের থলের মধ্যে একটি বোম, পিস্তল ও গুলি আর খঞ্জর আছে। থলি আমরা আমাদের বুকে বেঁধে রাখলাম।

তেল ট্যাংক থেকে রওনা হওয়ার পৌনে এক ঘণ্টা পর প্রথম চেকপোস্ট এল। সেখান থেকে ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর ট্যাংকার সামনে চলতে লাগল। প্রথম চেকপোস্ট থেকে রওনা হওয়ার ২০ মিনিট পর দ্বিতীয় চেকপোস্ট থেকে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে সামনে যাওয়ার আনুমানিক ১০ মিনিট পর ট্যাংকার বাম দিকে মোড় নিল। এখন আমাদের একদিকে পাহাড় আর অপরদিকে হল গুহা। রোডের উভয় দিকে কাঁটা তারের ঘন বেড়া। ট্যাংকার এ রোডে এসে গতি কমিয়ে দিল। তার কারণ হল এই যে, সম্মুখ থেকেও সমান তালে জিপ ট্রাক আসছে। পাহাড়ের বৃত্তের সাথে সাথে রোডও ঘুরছে। এ রোডে চলতে গিয়ে আমরা অনুভব করলাম যে, রোড আস্তে আস্তে ঢালুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আমাদের এক পাশে পাহাড় আর অপর পাশে সমতল ভূমি এল। আর এ সমতল ভূমিতেই নির্মিত রানওয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, যা পাহাড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। রানওয়েতে পৌঁছার পূর্বেই ট্যাংকার একটি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল এবং আনুমানিক একশ' মিটার যাওয়ার পর ট্যাংকার থেমে

গেল। আমরা বোমে ২০ মিনিট পরে ফোটার জন্য সময় সেট করলাম। এরপর ট্যাংকার থেকে পেট্রোল সুড়ঙ্গে নির্মিত ট্যাংকে ঢালা শুরু হল। সুড়ঙ্গকে বিদ্যুতের বাতিতে আলোকিত করা হয়েছে। তবে এ আলো বাইরের সূর্যের আলো থেকে কম।

আমরা সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ট্যাংকার থেকে ট্যাংক-এর অপর প্রান্ত দিয়ে বের হলাম। বের হয়ে আমরা দেখলাম যে, এই সুড়ঙ্গ সামনে পাহাড় খনন করে নির্মিত হলে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমাদের গায়ে ওভার অল থাকার কারণে আমাদের প্রতি কারো কোন সন্দেহ হল না। আমরা হেঁটে ঐ হলে পৌঁছলাম। হল এমন বড় যে, তাতে জাহাজের কয়েকটি হ্যাংগার রাখার ধারণ ক্ষমতা আছে। সেখানে আমাদের মত ওভার অল পরিহিত ডজন খানেক টেকনেশিয়ান দেখতে পেলাম, যাদের কেউ জাহাজ মেরামত করছে আর কেউ জাহাজ পর্যবেক্ষণ করছে। আমি আমার থলেতে রক্ষিত বোমে এখন থেকে ১৫ মিনিট পর ফাটার জন্য সময় সেট করলাম। তারপর হলে রক্ষিত জাহাজের দিকে হাঁটা দিলাম। আমি হেঁটে যখন হলের অর্ধাঅর্ধি পৌঁছলাম তখন ঐ পথ দেখতে সক্ষম হলাম, যাতে সমতল ভূমির রানওয়ে শুরু হয়েছে।

সুড়ঙ্গে আনুমানিক এক কিলোমিটার পর্যন্ত রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই পয়েন্ট থেকে হ্যাংগারে দাঁড়ানো বিমান টেক অফের জন্য স্টার্ট হয় এবং সুড়ঙ্গ থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার গতি এত বেশি হয় যে, সমতল ভূমি রানওয়ের কিছু অংশ অতিক্রম করেই শূন্যে উঠে যায়। আমি বিমানের দিকে এই ভেবে হাঁটা দিলাম যে, যদি কোন বিমানের ককপিটে জায়গা পাই তবে সেখানেই বোম ছুঁড়ে মারব।

এ সুযোগও খুব দ্রুতই পেয়ে গেলাম। আমি বোম একটি বিমানে ফেলে কায়সারের দিকে হাঁটা দিলাম। সে হলের সাথে আট ভাগে বিভক্ত সিমেন্টের উপর তৈরি ক্ষুদ্র রেলের লাইন দেখছিল। যা রানওয়ে বিশিষ্ট সুড়ঙ্গের হলের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এক লাইনে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এ আটটির একটি সুড়ঙ্গে চলে গেছে। আমরা ট্যাংকারের বোমে যে সময় সেট করেছিলাম তার মধ্যে আর মাত্র নয় মিনিট বাকি আছে। এমন সময় কায়সার আমাকে কানে কানে বলল, আমি নিশ্চিত যে এই লাইন বিমানে বোম বহনকারী ট্রলির জন্যে তৈরি করা হয়েছে। আমি তাকে অনেক বুঝালাম। কিন্তু সে আমার কথা শুনল না এবং সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। আর

আমি ট্যাংক বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে আসার জন্য হাঁটা দিলাম। কায়সার সুড়ঙ্গে গিয়ে কি করেছে তা তার কাছেই জিজ্ঞাসা করুন।

কায়সার বলতে শুরু করল যে, সময় কম থাকার কারণে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেই আমি দৌড়াতে লাগলাম। এই রেলপথ এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেল। সেখানেও আরেকটি বড় সুড়ঙ্গ রয়েছে যাতে ট্রাক আসতে পারে। যেখানে রেলপথ শেষ হয়েছে সেখানে সিরিয়াল দিয়ে বিভিন্ন সাইজের শত শত বোম এবং রকেট রাখা আছে। সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য দুইজন এয়ার ফোর্সের গার্ড ও একজন অফিসার রয়েছে। এই তিনজনই ওভার অল পরিহিত। গার্ড দু'জন সশস্ত্র, বাহ্যিকভাবে অফিসারের কাছে কোন অস্ত্র দেখতে পেলাম না। আমার গায়ে ওভার অল থাকার কারণে গার্ড পর্যন্ত পৌঁছতে কোন ব্যাঘাত পেতে হল না। আমি একজন গার্ডের কাছাকাছি গিয়ে সীমাহীন সতর্কতার সাথে খঞ্জর দিয়ে তার শাহ্ রগ কেটে ফেললাম। আমার বোমে আমি মাত্র দশ মিনিটের বিরতি সেট করলাম। তারপর আমার বোমে স্টকে রক্ষিত বোমের সাথে মিলিয়ে রেখে দিলাম এবং নিহত গার্ডের স্টেনগান হাতে নিলাম। এসব কাজ অপর গার্ড তখনই জানতে পেরেছে, যখন আমি তার একদম কাছে চলে গেছি। তারপর তাকেও খঞ্জর দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলাম। অফিসার দ্বিতীয় গার্ডের হাশর দেখে তার গায়ের ওভার অলের পকেট খুলে উর্দি থেকে পিস্তল বের করতে উদ্যত হল। অফিসার এখনও পুরোপুরি পিস্তল বের করতে পারেনি, আমি স্টেনগান থেকে তার উপর তিন চারটি গুলি ছুঁড়ে তাকে ওখানেই রেখে দিলাম। আর আমি ঐ বড় সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখের দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম।

সুড়ঙ্গে স্টেনগানের আওয়াজ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু কোথায় আওয়াজ হয়েছে তা কেউ নির্ণয় করতে পারল না। প্রবেশ মুখে দুইজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে ছিল। আমার গায়ে ওভার অল ও হাতে স্টেনগান দেখে আমাকে একজন সেন্ট্রি মনে করে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, ভিতরে গুলির আওয়াজ কেন হয়েছে? এতক্ষণে আমি দৌড়ানোর কারণে দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে যে হাঁপাচ্ছিলাম তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলাম। এবার তাদের প্রশ্নের জবাবে তাদেরকে বললাম, তোমরা কি এখনও কিছুই জান না? তারা উভয়েই আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে একযোগে বলল যে, আমরা কিছুই জানি না। আমি তাদের উপর স্টেনগানের গুলি

ছুঁড়ে তাদেরকে ভেতরের সংবাদ জানালাম। তারপর আমি রোডে উঠে ট্যাংকার প্রবেশের সুড়ঙ্গের দিকে দৌড়ালাম। কেননা হাবীব এ সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে আসার জন্য দৌড় দিয়েছে। এ সুড়ঙ্গের মুখেই হাবীব আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর আমরা উভয়েই ট্রাক ও জিপের পার্কিংয়ের দিকে দৌড়ালাম। সবেমাত্র পার্কিংয়ের কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় আমরা প্রথম ধামাকা শুনলাম। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে পার্কিংয়ে দাঁড়ানো একটি ট্রাকের কাছে গেলাম এবং একটি ট্রাকে মাত্র উঠে বসেছি এমন সময় দ্বিতীয় ধামাকা শুনলাম। তার একটু পরেই তৃতীয় ধামাকা হল। তারপর তো ধামাকা আর আগুনের লেলিহান শিখার বহর শুরু হয়েছে।

আমি ট্রাকে চাবি না থাকার কারণে তার ড্যাশবোর্ড থেকে তার বের করলাম এবং তার জোড়া দিচ্ছি এমন সময় ট্রাক থরথর করতে শুরু করল। আর মাটি দুলতে লাগল। এ ভয়াবহতা অয়েল ট্যাংকে অথবা আর্সেনাল-এ বোম ফাটার কারণে হয়েছে। আমরা ট্রাক স্টার্ট করলাম এবং দ্রুতগতিতে ফিরার জন্য রওনা হলাম। হঠাৎ কানের পর্দা বিদীর্ণকারী বিকট ধামাকা হল। এ ধামাকা সম্ভবত আর্সেনাল-এ রক্ষিত বোম একযোগে ফাটার কারণে হয়েছে। এই ধামাকায় মাটি এমনভাবে কেঁপে উঠল যে, আমাদের ট্রাক কয়েক ফিট উপরের দিকে লাফ মারল। আমরা বহু কষ্টে স্টেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। এখনও আমরা রোডের ঐ মোড় পর্যন্ত আসতে পারিনি, যেখানে সুড়ঙ্গ চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনটি সুড়ঙ্গ থেকেই এক সাথে আগুনের গোলা বের হয়েছে। আর মাটি থরথর করে কাঁপছে। আগুনের তীব্রতা আমরা ট্রাক থেকেই অনুভব করছি। তারপর আমি ট্রাকের গতি এমনভাবে বাড়িয়ে দিলাম যে, প্রথম বেরিকেড দ্রুত গতির ট্রাক ভেঙ্গে ফেলল। মাটি কাঁপার কারণে মেস ও কলোনীর অধিবাসীরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আমি ট্রাকের এক্সেলেটারে চাপ দিয়েই রেখেছি। তারপর দ্বিতীয় বেরিকেডও ট্রাক ভেঙ্গে ফেলল। এভাবে আমরা Restricted Area থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে দুই মাথার মুখে দেখলাম যে, আপনারা আমাদের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। এবার হাবীব বলল যে, স্যার! আপনি যে আগুনের কুণ্ডলি দেখেছেন তা মূল আগুনের দশ ভাগের এক ভাগও না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, আপনাদের ও আগুনের মাঝে আরো কটি পাহাড় আছে। আমরা

দুই নয়নে যা দেখেছি বলতে গেলে তা একটি ছোট কিয়ামত। এই আগুনে সেখানকার মানুষসহ সবকিছু ছাই হয়ে যাবে।

এখানে আমি আপনাদেরকে একটি বাস্তব কথা বলতে চাই। আর তা হচ্ছে এই যে, এই মিশন সফলতার পিছনে হাবীব কায়সারের আর কায়সার হাবীবের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে। উভয়ের কথার মর্মার্থ এই যে, দুইজন ছাড়া এ মিশন কিছুতেই সফল হত না। তারা উভয়েই তাদের জীবন বাজি রেখে আমাদের চিফ থেকে নিয়ে এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক সদস্যের অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে পূর্ণতায় রূপ দিয়েছে।

পাকিস্তান থেকে এ মিশনের সফলতায় আকাশ কুসুম আমাদের ভরপুর প্রশংসা করা ছাড়াও তাদের দুইজন বিশেষ করে এ মিশনে অংশগ্রহণকারী সাথী ও ছেলেদের যে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, সেই উপহার কামনারও কয়েকগুণ বেশি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ভারত সরকার ও এয়ার ফোর্স ধ্বংসযজ্ঞকে একদম গোপন করেছে। আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত এ সংবাদ সকল দৈনিকে খুঁজলাম। কিন্তু এত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের খবর কোন পত্রিকাতেই পেলাম না। শুধুমাত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াতে The mass pyre inmountain -এর শিরোনামে সংবাদ ছেপেছে যাতে খুব সতর্কতার সাথে বিমান বন্দরের ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের কারণ নিশ্চিত এটাই যে, এ ঘটনার প্রচারে ভারত নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে স্বীকার করা এবং নিজের মুখে নিজ হাতে থাপ্পর মারা। হিন্দুদের মাথায় তো এটা আছে যে, তারা কখনও নিজেদের ভুলকে স্বীকার করে না। সর্বদা নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এখন কাশ্মীরে ৬ লাখেরও বেশি সৈন্যের উপস্থিতিকে ভারতের সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে। জোনাগড়, হায়দারাবাদ শুধুমাত্র এইজন্য দখল করা যে, এখানে সংখ্যায় হিন্দুরা বেশি। পক্ষান্তরে কাশ্মীরে মুসলমানদের আধিক্যতাকে দৃষ্টিগোচর করে তদানীন্তনকালের ভারতীয় মহারাজা হরিসিং-এর সংযুক্তিকে কারণ উল্লেখ করে কাশ্মীর দখল করা ভারতের চিন্তা চেতনার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সাথীদের ঘরে বসে থাকলাম এবং এই স্পর্শকাতর মিশনের পরিপূর্ণ সফলতা নিয়ে পর্যালোচনা করতে থাকলাম। আর নাজির আমাদের মেহমানদারী করতে থাকল। সন্ধ্যা বেলায় সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি ও কায়সার রাস্তায় চলে এলাম। তারপর আমরা উভয়েই

আমাদের প্রত্যেকের ব্রিফকেস দুটি ট্যাক্সিতে রেখে কায়সার তার বাসার উদ্দেশে আর আমি আমার হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। হোটেলে পৌঁছে কয়েকদিন পূর্বে প্রেরিত কর্নেল শংকরের পয়গাম পেলাম। পয়গামে সে বলেছে যে, সংবাদ পাওয়া মাত্র তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য।

পরদিন সকালে পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য রাতে আমি এ মিশনের পরিপূর্ণ রিপোর্ট লিখলাম। এ রিপোর্টে এও লিখলাম যে, ভারত সরকার এত বড় ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়েছে। কোন পত্রিকায় এ ঘটনা সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রচার হয়নি। পরদিন ট্রান্সমিটারযোগে যোগাযোগের সময় আমি সাথীদের ঘরে চলে গেলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করলাম। হাবীব খুবই সংক্ষিপ্তভাবে সংবাদ ট্রান্সমিট করল যে, 'গ্রুপ লিডার এবং দুই সাথী ফিরে এসেছে। আর গ্রুপ লিডার এখানে উপস্থিত রয়েছে।' এর জবাবে পাকিস্তান থেকে আমাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হল যে, বিস্তারিত তথ্য ডাক মারফত পাঠাও। এছাড়া অতিরিক্ত এটা বলা হল যে, নতুন পথে ডাক গ্রহণকারীদের মধ্য হতে কয়েকজন সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছে। তাই প্রথম পথের প্রথম কুরিয়ারের সাথে আগামী শুক্রবার বিকাল চারটায় সর্বশেষ কন্ট্রাক্ট স্টপ-এ সাক্ষাত করো। লাহোরের পথে আগমনকারী কুরিয়ারকে যদি দেখতে পাও তবে তাদের সামনে যেয়ো না। কেননা তারা শত্রুর হাতে বন্দি। ক্যাপ্টেন আরশাদের সাথে সাক্ষাত করার সময় তোমার সকল সাথীকে ঐ কুরিয়ার দেখেছে। তারাও যেন তাদের নজর থেকে দূরে থাকে। পাকিস্তান থেকে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা পাই। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ নিশ্চিতভাবে ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে তা ক্যাচ করে থাকে। পাকিস্তানের ট্রান্সমিটারের তো কোন ক্ষতি করতে পারে না। ভয় শুধু আমাদের ট্রান্সমিটার থেকে সংবাদ পাঠানোর সময়। এ বিপদকে সামনে রেখে আমরা আমাদের সংবাদ বেশির চেয়ে বেশি এক মিনিটের জন্য ট্রান্সমিট করি। আর এ স্বল্প সময়ে আমাদের ট্র্যাস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

আগামী দুই মাসে গোরখপুর সংক্রান্ত যে তথ্য আমরা পেয়েছি, তা পেয়েছি বিভিন্ন মাধ্যমে। এর মধ্যে কর্নেল শংকরও রয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, গোরখপুর কেন্দ্রীয় শহর হওয়ার কারণে এই গোপন বিমান বন্দরকে গোরখপুরের বিমান বন্দর বলা হয়। মূলত এ বিমান বন্দর গোরখপুর থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে চান্দাওয়ালের

নিকটে তৈরি করা হয়েছে। এ বিমান বন্দরের রানওয়ে হচ্ছে মুহেন্দওয়ালের দিকে এবং আবাসিক কলোনী ও মেস ইত্যাদি পাহাড়ের পাশে গোরখপুরের দিকে। এই বিমান বন্দর থেকে টেক অফের পর বিমান প্রশিক্ষণার্থী ও Routine-এর উড্ডয়নকারীদের জন্য আকাশে উড়তো।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ সংবাদও পেয়েছি যে, আমাদের ধামাকার কারণে পাহাড়ের অভ্যন্তরে বিদ্যমান সমস্ত লোকও বিমান এবং অস্ত্র জ্বলেপুড়ে ছাই-এ পরিণত হয়েছে। এ ধ্বংসলীলার কারণ নির্ণয় করার জন্য উপরস্থ অফিসারদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোন কমিশনই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করতে পারেনি। এ বিমান বন্দর ধ্বংসের পর আনুমানিক এক বছর পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এসব তথ্য আমি বোম্বাই ও পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পূর্বক্ষণে নেপালে বসে জেনেছি।

*　　*　　*

আগামী শুক্রবার আমাকে প্রথম কুরিয়ারের সাথে সাক্ষাত করতে হবে। আমি টাইমস অব ইন্ডিয়ার এ সংবাদ সম্বলিত কয়েকটি পত্রিকা ক্রয় করলাম পাকিস্তান পাঠানোর জন্য। তারপর এ মিশনের বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করলাম। আমার অনুপস্থিতিতে দিল্লীতে যশোবন্ত থেকে যত ডাক সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোও দিল্লীতে রয়ে যাওয়া সাথীরা তৈরি করে রেখেছে। এবার আমাদের ডাকের প্যাকেট কিছুটা বড় হয়ে গেছে। তারপর বৃহস্পতিবারে আমি কর্নেল শংকরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। নিয়মানুযায়ী সে সার্ভিস ক্লাবের লেনে আসর জমিয়েছে। কুশল বিনিময়ের পর আমি তাকে বললাম যে, আমি ব্যবসায়ী কাজে বুম্বাই গিয়েছিলাম। আমি দিল্লীতে অনুপস্থিত থাকাকালে আপনার প্রেরিত সংবাদ হোটেলে ফিরে আসার পর পেয়েছি। আর সংবাদ পাওয়ার পরপরই আপনার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি। কর্নেল শংকর আমার কথাগুলো চেয়ারে হেলান দিয়ে নীরবে শুনছিল। আমার কথা বলা শেষ হলে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল এবং কানে কানে বলার মত করে নীচুস্বরে বলল, তুমি কি গোরখপুরেও গিয়েছো? কর্নেল শংকরের মুখে গোরখপুরের নাম শুনে আমার রগগুলো ফুলে উঠেছে। আমি আমার অনুভূতি শক্তিতে শক্তি সঞ্চয় করার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। আমি দম বন্ধ করে এক ধ্যানে কতক্ষণ তাকে দেখতে থাকলাম। আমি নিশ্চিত যে কর্নেল শংকরও আমার এ হতভম্বতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই সে ঠাণ্ডা পানির গ্লাস আমার সামনে রাখামাত্রই তা আমি গট গট করে এক নিঃশ্বাসে পান করে

ফেললাম। এরপর যখন আমার অস্থিরতা নামেমাত্র হ্রাস পেল তখন আমি কর্নেল শংকরের চেহারায় হাল্কা মুচকি হাসির রেখা দেখলাম। তার চেহারায় হাসির ঝলক দেখে সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিলাম যে, আমি বুম্বাই থেকে ফেরার পথে গোরখপুরেও গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েছিলাম আমার চায়ের এডভান্স করার জন্য। আমি জবাব অবশ্য দিলাম বটে তবে আমার বাকশক্তি নড়বড়ে হয়ে গেল। আমার এই অবস্থা কর্নেল শংকর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখছিল। তারপর ক্ষাণিক বিরতি দিয়ে বলল যে, তুমি অনুদ হও অথবা নোবেদ হও এতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার জন্য তো শুধুমাত্র অনুদ। যে কাজই কর খুব সতর্কতার সাথে দেখেশুনে করো। একথা বলার পর সে চুপ হয়ে গেল এবং নিজের জন্য নতুন পেয়ালা তৈরি করতে লেগে গেল। কর্নেল শংকরের এই কথা বহু কষ্টে স্থিরকৃত আমার অনুভূতিকে নড়বড়ে করে দিল। আমার মন মগজে প্রলয়ংকরী ঝড় বয়ে গেল। আমার কাছে তার কথাগুলো হচ্ছে অপ্রত্যাশিত। আমি তার সামনে এমন একজন অপরাধীর ন্যায় বসে আছি যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। এখন সে তার সাজা শুনার অপেক্ষায় বসে আছে। আমার এ অবস্থা দেখে কর্নেল শংকর বাস্তবিকই আনন্দিত হয়েছে। তারপর সে তার ভঙ্গিমায় বলল, আমি একটি অফিসিয়াল কাজে গোরখপুরে গিয়েছিলাম। আমি তখন তোমাকে সেখানে দেখেছি। তোমার সাথে আরো দুই তিনজন লোক ছিল। আমি জিপে করে সেনানিবাসে যাচ্ছিলাম বিধায় থামতে পারিনি। আমি গোরখপুরে দুইদিন থেকে তারপর দিল্লী ফিরে এসেছি। কর্নেল শংকর এখন আবার পূর্বের সেই হাসি তামাশার কথা শুরু করে দিল। আমি অন্যমনষ্ক হয়ে তার সঙ্গ দিতে লাগলাম ঠিকই তবে আমার মগজে তার কথিত শব্দ একাধারে অনুরণিত হতে লাগল, 'তুমি অনুদ বা নোবেদ হও এবং যেই কাজ কর খুব সতর্কতার সাথে দেখেশুনে করো'। একথা আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে তার অবগতির ইঙ্গিত বহন করে।

কথোপকথনের ফাঁকে সম্ভবত কর্নেল আমার অস্থিরতা দূর করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গোরখপুরের আলোচনা শুরু করে দিল। 'অনুদ তুমি কি জান যে, কয়েকদিন পূর্বে গোরখপুরে কি কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে?' আমি মাথা দুলিয়ে না বললাম। তারপর সে বলতে শুরু করল, সেখানে এয়ার ফোর্সের এক গোপন বিমান বন্দরে হঠাৎ করে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। যে আগুনে বিমান, অস্ত্রাগার (ARSENAL) এবং অয়েল ট্যাংকও জ্বলেপুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এর সাথে দুই শয়েরও অধিক এয়ারফোর্স

পার্সোনেলসহ সবকিছুই আগুনে গ্রাস করেছে। অথচ এ বিমান বন্দরে এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে এ নিরাপত্তাব্যূহ ভেদ করে কোন দুষ্কৃতকারীর প্রবেশ করার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। পরিতাপের বিষয় যে, এ রাক্ষুসী আগুনের রাহুগ্রাস থেকে এমন কেউ বাঁচতে পারেনি যে এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষ্য দিতে পারে। শুধুমাত্র একটি ট্রাক এ ট্র্যাজেডির কবল থেকে বের হতে পেরেছে। এই ট্রাক দুইটি নিরাপত্তা ব্রেকেট ভেঙ্গে বহু কষ্টে সংরক্ষিত এরিয়া থেকে বের হয়ে এসেছে। শুধুমাত্র এ ট্রাকের ড্রাইভারই এ ট্র্যাজেডির চাক্ষুস সাক্ষী ছিল। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস যে, এ ঘটনার ভয়াবহতায় সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ট্রাক কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয়। যার কারণে ট্রাক খাদে পড়ে গিয়ে ড্রাইভারসহ জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ট্র্যাজেডি সম্ভবত এয়ার ফোর্সের ক্রু-এর উদাসীনতার কারণেই সংঘটিত হয়েছে। কর্নেল কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর জিজ্ঞাসু নেত্রে বলল, শুধুমাত্র একটি ক্লু আছে যা এ ঘটনাকে দুস্কৃতকারীদের কাজ হিসেবে প্রমাণ করে। আর সেই ক্লু হচ্ছে এই যে, দুর্ঘটনার দিনে গোরখপুরের দুইজন লোককে বিমান বন্দরের রোডে বেহুঁশ পাওয়া গেছে। তাদের ভাষ্য হচ্ছে এই যে, ঐদিনেই তাদের গাড়ি পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাই করা হয়েছে। তাদের মাথায় আঘাত করে তাদেরকে বেহুঁশ করা হয়েছে। তারপর তারা তাদের গাড়ি ফয়েজ আবাদের নিকটে জ্বলন্ত অবস্থায় পেয়েছে। তারা এও বলেছে যে, তারা ছিনতাইকারীদের আচরণে ভীত-বিহ্বল থাকার কারণে ছিনতাইকারীদেরকে ভাল করে দেখতে পারেনি। তাদের বর্ণনা থেকে শুধু একটি ক্লু পাওয়া গেছে যে, সেই ছিনতাইকারীদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ বর্ণের লম্বা লোক ছিল। কর্নেল এ কথা বলে আবার চুপ হয়ে গেল এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগল। সম্ভবত সে আমার অস্থিরতা দেখে আনন্দ অনুভব করছে। তারপর হঠাৎ করে আবার বলল যে, 'অনুদ কি আশ্চর্য মিল যে, তুমি একজন শ্বেতাঙ্গ বর্ণের ও লম্বা লোক এবং ঐ ঘটনার দিন গোরখপুরেই ছিলে।' একথা শুনার পর আমার পক্ষে চুপ থাকা অসম্ভব হয়ে গেল। তাই আমি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, কর্নেল সাহেব! আমার প্রতি যদি আপনার সন্দেহ থেকে থাকে তবে আমাকে কেন গ্রেফতার করছেন না? আমার কথায় কর্নেল অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল এবং বলল যে, সন্দেহ নয় বরং আমি নিশ্চিত যে, তুমি সে শ্বেতাঙ্গ বর্ণের লম্বা লোক নও যার বিবরণ গাড়ির মালিকদ্বয় দিয়েছে। ভারতে তোমার মত মানুষ তো আরও হাজারো

লাখো রয়েছে। একথা তো শুধুমাত্র ঠাট্টা করে বলেছি। হেড কোয়ার্টারে এ ঘটনার যে রিপোর্ট এসেছে আমি সে রিপোর্টের আলোকেই তোমাকে সব ঘটনা বলেছি। এয়ার ফোর্স ওয়ালারা তো নিজেদের অযোগ্যতা ও সিকিউরিটি ব্যবস্থার দুর্বলতাকে ঢাকার জন্যে এ ট্র্যাজেডির সংবাদ গোপন করেছে। তোমাকে জানানোর জন্য আমি এ ঘটনা তোমার কাছে বললাম। এরপর কর্নেল এদিক সেদিকের কথা শুরু করে দিল। এ আলোচনার দুই ঘণ্টা পর আমি কর্নেল থেকে বিদায়ের জন্য অনুমতি চাইলাম। তখন সে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং আমার সাথে হাত মিলাতে গিয়ে কানে কানে বলল, আমি একথা এজন্য বলেছি যে, যাতে করে তুমি এ ট্র্যাজেডির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পরিমাপ করতে পার। তারপর সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ভবিষ্যতে কোনদিন গোরখপুরে যেয়ো না।' আমি কর্নেল শংকর থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তারপরও আমার মন মগজে গণ্ডগোল প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পেল। যার কারণে সে রাতে আর ঘুমাতে পারলাম না। কর্নেলের কথা আমাকে একদম এ্যাবনরমাল করে দিয়েছে।

* * *

পরদিন শুক্রবার হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে ডাকের প্যাকেট নিয়ে কুরিয়ারের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি সশস্ত্র হয়ে আমার একজন সাথীকে সশস্ত্র করে আমার সাথে নিয়েছি আমাকে কভার দেয়ার জন্য। কর্নেল শংকর থেকে অর্জিত তথ্যও এ ডাকের সাথে সম্পৃক্ত করেছি। নির্দিষ্ট সময়েই কুরিয়ারের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আমরা একে অপরের প্যাকেট আদান-প্রদান করলাম। ট্রেনিংকালে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে আগামীতে ডাক আদান-প্রদান করার জন্য নতুন স্থান ও নতুন করে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করলাম। সেদিন তারিখ সম্পর্কে শুধুমাত্র আমি আর আমার কুরিয়ার বাদে অন্য কেউ জানবে না। আমি কুরিয়ারকে এটাও বলে দিয়েছি, আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য যেন সে একা আসে। তার সাথে কোন সাথীকে যেন কখনও না আনে।

এই কুরিয়ার যেহেতু আমার সাথীদের সম্পর্কে কিছুই জানে না তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সামনে থেকে শুধুমাত্র আমি একা ডাক আদান-প্রদান করতে যাব। আর আমার এক সাথী কুরিয়ারের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাকে কভার দিবে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন লোক যাবে। আমি সাথীদের

এটাও বলে দিয়েছি, যদি কখনও লাহোরী কুরিয়ারকে দেখে ফেল, তবে তার নজরে পড়ার আগেই লুকিয়ে যাবে। কেননা সে এখন ভারতের হাতে বন্দি।

কর্নেল শংকর থেকে গোরখপুর সম্পর্কে আলোচনা করে সেখানে বিমান বন্দর ধ্বংসের বিস্তারিত তথ্য পেয়েছি। সেখানে বিটুইন দ্যা লাইন, সে আমাকে এটাও বলেছে যে, ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ গাড়ির মালিকদের তথ্য অনুপাতে শ্বেতবর্ণের লম্বা এক ব্যক্তিকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে। এটা নিশ্চিত যে, গাড়ি জ্বালিয়ে দুস্কৃতকারীরা ফয়েজ আবাদ বসে থাকেনি। বরং তারা ট্রেনযোগে হয়তো গোরখপুর হয়ে মোজাফফরনগর পৌঁছে গেছে অথবা লক্ষৌর দিকে গেছে। তারপর মোজাফফর নগর গমনকারীদের গন্তব্য হতে পারে নেপাল। আর লক্ষৌ গমনকারীদের গন্তব্য প্রথমে কানপুর, তারপর ভারতের যে কোন অঞ্চল হতে পারে। যদি তারা গত দেড় বছরের ধামাকাকে সামনে রেখে তদন্তকে সামনে অগ্রসর করে তবে দিল্লীতে নিউ এয়ার নাইট, এয়ারপোর্ট এবং ২৬শে জানুয়ারির ধামাকার কারণে তদন্তের জন্য দিল্লীকেই প্রধান শহর হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। কর্নেল শংকর কর্তৃক আমাকে সতর্ক থাকতে বলা এবং ভবিষ্যতে কোনদিন গোরখপুরে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়াও এ কথার প্রতিই ইংগিত করে যে, গোয়েন্দা বিভাগ আঁটঘাট বেঁধেই আমাদের সন্ধানে চিরুণি অভিযান শুরু করেছে। তারপর অপরদিকে পাকিস্তান থেকে ট্রান্সমিটার মারফত পুরাতন পথে পুরাতন কুরিয়ারের সাথে পুনরায় ডাক প্রেরণ করতে বলা হয়েছে। আর লাহোর সীমান্ত থেকে আগমনকারী কুরিয়ার তার সাথীসহ ধরা পড়ার খবর এ কথাই প্রমাণ করে যে, লাহোরের কুরিয়ার ভারতের সীমান্তে ধরা পড়েছে। এখন দিল্লীতে তার উপস্থিতির একটিই মাত্র কারণ হতে পারে যে, সে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সবকিছু বলে দিয়েছে এবং সে তদন্তকারীদের চাহিদা পূরণার্থেই আমাকে খুঁজছে। এসব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ট্রান্সমিটার, পিস্তল, গুলি আর ক্যামেরা ছাড়া আমার ও সাথীদের কাছে যত আসবাব আছে যার দ্বারা আমাদের মূল পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে সেসব আরিফের বাড়িতে পাঠিয়ে দিব। শুক্রবার দিন আমি ডাক উসুল করেছি আর রবিবার দিন এ কাজ করলাম। এসব আসবাব আরিফের ঘরে পাঠানোর পিছে কারণ হচ্ছে

এই যে, আরিফদের সাথে বাহ্যিকভাবে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তার ঘরই অধিক নিরাপদ, অন্য ঘরের তুলনায়।

আমি দিল্লীতে আমার ও সাথীদের বাসা পরিবর্তন করার চিন্তা করলাম। কিন্তু কোন স্থানই নিরাপদ মনে হল না। বর্তমান অবস্থানরত বাসায় আমরা দুই বছর যাবত আছি। সাথীদেরকেও এলাকাবাসীরা ব্যবসায়ী হিসেবেই চিনে। তাদের এমন কোন এ্যাক্টিভিটি এলাকাবাসীর সামনে নেই, যার কারণে তাদের প্রতি সন্দেহ জাগতে পারে। পক্ষান্তরে বাসার মালিক নাজির ও আরিফ তাদের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য প্রস্তুত। অন্যদিকে লুধি হোটেলে আমার দীর্ঘ দিনের অবস্থান আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট। হোটেলের সকল কর্মচারীই আমাকে চা ব্যবসায়ী হিসেবে চিনে এবং সাক্ষ্য দিবে। এই হোটেলেই আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডিএমআই ওয়ালারা একবার এসেছিল। তারাও আমাকে ক্লিয়ার করে দিয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে পরবর্তীতে বাসা পরিবর্তনের চিন্তা মন থেকে দূর করে ফেললাম। সাথীদেরও বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাবনাময় বিপদ সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং তাদের রেড এলার্ট পজিশনে থাকতে বললাম। আর কারাতে কুংফুতে দক্ষ সাথীকে আমার লুধি হোটেলে আমার ফ্লোরের এক কামরায় বদলি করে আনলাম। যাতে করে সে প্রতিকূল অবস্থায় আমাকে কভার দিতে পারে এবং আমার সমস্যার কথা সাথীদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এখন আমাদের সাথে শুধুমাত্র অস্ত্র আর ট্রান্সমিটার রয়েছে। আর এগুলো সর্বাবস্থায়ই আমাদের সাথে রাখতে হবে। তাছাড়া আমি সাথীদের এটাও বলেছি যে, পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, তাদের গ্রেফতার হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সিটিং ডাক-এর মত কোন প্রতিরোধ ছাড়া এমনি এমনি ধরা দিবে না। বরং জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে। ধরা পড়লে তো নির্যাতনের মৃত্যু নিশ্চিত কথা। অতএব, মরার আগে শত্রুর যত ক্ষতি করা যায় তাতেই লাভ। তাছাড়া গ্রেফতার করার জন্য বেশির থেকে বেশি পনের বিশজন লোক আসবে হয়তো। তবে তারা হচ্ছে পেটের দায়ে চাকরিকারী, তোমাদের মত নয়। তাই দু'একটি গুলি ছুটার পর ভয়ে তারা পালাবে। আর জন্মগতভাবেই তো হিন্দুরা ভীতু। অতএব অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে তারা ভেগে যাবে আর এ সুযোগে তোমরা জান নিয়ে পালাতে পারবে।

আমাদের এখন কোন বিশেষ মিশন নেই। আর পাকিস্তান থেকেও আমাদেরকে কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। পরিস্থিতির আলোকে আমরা

চাচ্ছি কিছু সময় নীরবে কাটাতে। এখন আমাদের কাজ শুধু ডাক উসুল করে পাকিস্তান পাঠানো এবং নির্দিষ্ট সময়ে ট্রান্সমিটারযোগে সংবাদ পাঠানো পর্যন্তই। আমার সাথী প্রত্যেকদিন রবিবার ছাড়া সন্ধ্যা বেলা বশীরের গ্যারেজে যায় এবং ছেলেদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়। এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল গ্রীষ্মকাল এবং গ্রীষ্মকাল যৌবনে পদার্পণ করছে। এমন সময় (১৯৭৪ ইং মে মাসে) ভারত সরকার রাজস্থানের মরুভূমিতে এটমি ধামাকা করল। ভারতের এই এটমি ধামাকা সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ভারতীয় দৈনিকগুলো এ ধামাকার সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে পাকিস্তানকে নিয়মিতভাবে বিশাল ভারতে একীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য ধমকের সুরে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। এ ধারাবাহিকতা এক সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। আমি ও আমার সাথীরা ভারতের এ ধামাকার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। একদা আমরা বসে কথাবার্তা বলছি তখন আমাদের কথার মোড় ঘুরে গেল সেই এটমি ধামাকার দিকে। আমি সাথীদের বললাম– ভাইয়েরা আমার! তোমরা ভারতের এ ধামাকার কারণে ভীত হয়ো না। পাকিস্তানের বিজ্ঞানীরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা আমাদের অবগত করে যে, এশিয়া মহাদেশে ঝড়ো হাওয়া সর্বদা পশ্চিম দিক থেকেই শুরু হয়েছে। হাজার বছর পূর্বে এ অঞ্চলে আরিয়ান থেকে শুরু করে সেকান্দর আজম, লুধি, সেলজুকি, তুঘলক গজনবী, দাস বংশধর, মোগল এবং আহমদ শাহ আবদালী পর্যন্ত সকলেই পশ্চিম দিক থেকে এসেছেন এবং এ অঞ্চলকে শাসন করেছেন। আফসোস! আমরাও এখন ভারতের পশ্চিম প্রান্তেই আছি। ইনশাআল্লাহ! আমরাও অতীতের স্রোতধারাকে অব্যাহত রাখব। আমার সাথীরাও গ্যারেজের ছেলেদেরকে এভাবেই সান্ত্বনা দেয়। যদিও পরিস্থিতি এখন একটি উত্তালহীন শান্ত সমুদ্রে রূপ নিয়েছে তবুও আমার পঞ্চইন্দ্রিয় আমাকে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ শান্ত সমুদ্রের পিছে এক প্রলয়ংকরী ঝড় ধেয়ে আসছে। তারই পূর্বাভাস হলো এই এটমি ধামাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৮১৭৬২৮৬৭৮